বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

শ্রীসুকুমার সেন
এম্-এ, পি-এইচ্-ডি
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
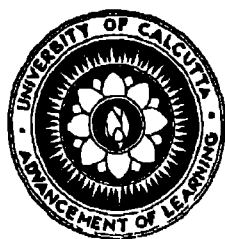
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
১৯৩১

॥ স্বর্গতা কনিষ্ঠা ভগিনী ভক্তির স্মরণে ॥

(১৩১৭—১৩২৬)

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতাব্দী

বিষয় পৃষ্ঠা

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ

বিষয় | পৃষ্ঠা

ভূমিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থের অভাব নাই। কিন্তু স্বল্পপরিসরের মধ্যে সর্ব্বজনপাঠ্য প্রামাণ্য ধারাবাহিক ইতিহাসের বিশেষ অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণের জন্যই "বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা" লিখিত হইল। ইহাতে যতদূর সম্ভব খুঁটিনাটি বাদ দিয়া সকল প্রয়োজনীয় তথ্য ও তত্ত্ব বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। মল্লিনাথের কথায়—নামূলং লিখ্যতে কিঞ্চিন্ নানপেক্ষিতম্ উচ্যতে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ এবং সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের আগ্রহ না থাকিলে বইটি এত শীঘ্র প্রকাশিত হইত না। তজ্জন্য ইহাদিগকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসুকুমার সেন

প্রথম পরিচ্ছেদ

দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী

১

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি যুগ

বাঙ্গালা দেশে আর্য্যদিগেব আগমনের পূর্ব্বে যাহারা বাস কবিত তাহাদেব সভ্যতা আদৌ উচ্চাঙ্গেব ছিল না, এবং সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় এমন কিছুও তাহাদের ছিল না। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্য সম্রাটদিগের সময় হইতেই এদেশে আর্য্যদিগের বসতি আরম্ভ হয়, এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যেই বাঙ্গালাদেশের প্রায় সর্ব্বত্র ইহাদের দ্বারা অধ্যুষিত হয়। আর্য্যেরা উত্তম-পশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়া ছিলেন। ইহাদের পোষাকী অর্থাৎ শিক্ষা, বিদ্যাচর্চ্চা ও সামাজিক ব্যাপারের ভাষা ছিল সংস্কৃত ; আর আটপহরিয়া অর্থাৎ ঘরোয়া ভাষা ছিল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত ভাষা।

এদেশে সাহিত্যের চর্চ্চার পত্তন হয় এই সব উপনিবিষ্ট আর্য্যদিগের দ্বারা। প্রথম কয় শত বৎসর তাঁহারা যাহা কিছু লিখিতেন সবই সংস্কৃতে, দৈবাৎ প্রাকৃতে। এই সব লেখার নমুনা পাই তাম্রপট্টে লিখিত অনুশাসনে বা ভূমিদাব পত্রে এবং দুই একটি মহাকাব্যে আর কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকে। বাঙ্গালা দেশে রচিত সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কাব্য

হইয়াছে রামচরিত। এটি রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে লেখা। কাব্যটির রচয়িতার নাম অভিনন্দ। অনুমান হয় যে, ইনি সম্রাট দেবপাল দেবের অনুচর ছিলেন। তাহা হইলে ইনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, ধরিতে হইবে। পাল সম্রাটদিগের রাজত্বকালে আরও একটি কাব্য রচিত হইয়াছিল দশম শতাব্দীব শেষ ভাগে। এই কাব্যটিরও নাম রামচবিত। ইহাতে রামায়ণ-কাহিনী এবং সম্রাট রাম-পাল দেবের জীবনী একই সঙ্গে দ্ব্যর্থের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বামপাল দেবের পুত্র মদনপাল দেবের অনুচর ছিলেন।

পাল রাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাহাব পর বর্ম্ম ও সেন বংশের রাজত্ব। ইহারা আরও বিদ্যোৎসাহী এবং সাহিত্যামোদী ছিলেন। সেকালের প্রায় সকল বড় পণ্ডিত ও কবি সেনরাজদিগের সভা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লক্ষ্মণসেন দেবেব সভায় উমাপতি ধর, শরণ, ধোয়ী এবং জয়দেব এই চারি জন বিখ্যাত কবির সম্মেলন হইয়াছিল।

সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন জয়দেব। ইহার গীতগোবিন্দ-কাব্য শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বিষয়ে রচিত। গীতগোবিন্দে চব্বিশটি গান বা পদ আছে। এগুলি সংস্কৃতে রচিত হইলেও ইহাদের শ্রুতিমধুরতা শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই মনোহরণ করে। প্রকৃতপক্ষে, এই পদগুলি লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের সূত্রপাত। পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব কবিরা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে জয়দেবের নিকট ঋণী। জয়দেবের নিবাস ছিল অজয় নদের ধারে কেন্দুবিল্ব গ্রামে।

এই গ্রাম এখন কেঁদুলী বা জয়দেব-কেঁদুলী নামে বিখ্যাত। জয়দেবের স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে এই স্থানে আবহমান কাল ধরিয়া প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময়ে বিরাট মেলা বসিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের দূরতম অঞ্চল হইতেও সাধু-বৈষ্ণব আসিয়া এই মেলায় যোগ দিয়া থাকেন। জয়দেব ও তাঁহার পত্নী পদ্মাবতীর সম্বন্ধে নানা গল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে। তবে তিনি যে কিছুকাল পুরীতে জগন্নাথদেবের সেবক বা ভক্তরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জয়দেবের সময় হইতে জগন্নাথদেবের নিকট প্রত্যহ গীতগোবিন্দের পদ গীত হইয়া আসিতেছে।

সংস্কৃত ভাষা লোকের মুখে মুখে কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হয়। এই প্রাকৃত ভাষা ভাঙ্গিয়া আবার বিভিন্ন আধুনিক ভাষা—যেমন বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিল, হিন্দী, উর্দ্দু, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি—উৎপন্ন হইয়াছে। আধুনিক ভাষায় পরিণত হইবার ঠিক পূর্ব্বে প্রাকৃতের যে রূপ ছিল, তাহাকে বলা হয় অপভ্রংশ। সেন রাজাদের সময়ে অপভ্রংশ ভাষারও কিছু কিছু চর্চ্চা হইত, তাহা অবশ্য রাজসভায় বা বিদ্বদ্‌-গোষ্ঠীতে নহে, সাধারণ লোকের মধ্যে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সিদ্ধাচার্য্য এবং সাধকদিগের মধ্যে। এই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যেরা বাঙ্গালাতেও পদ লিখিতেন। যতদূর জানা গিয়াছে, ইঁহাদের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ কিছু রচনা করেন নাই। তাহা করিবারও কথা নয়। কেননা, এই সময়েই—অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতেই—বাঙ্গালা ভাষা অপভ্রংশ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র ভাষারূপে মূর্ত্তি লাভ করে।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদিগের লেখা একটি গানের বইয়ের পুঁথি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরবারের পুস্তকালয় ঘাঁটিয়া আবিষ্কার করেন এবং ১৩২৩ সালে, আরও কয়েকটি পুঁথির সঙ্গে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাহায্যে প্রকাশিত করেন। মূল বইটিতে একান্নটি পদ ছিল, তাহার মধ্যে একটি পদ পুঁথি-লেখক বাদ দিয়াছেন, এবং পুঁথির কয়েকটি পাতা হারাইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে মোটমাট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পদগুলিতে পদকর্ত্তার নাম ভণিতা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। পদগুলি যে যে সুরে গাহিতে হইবে তাহারও নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। পুঁথিটিতে অধিকন্তু আছে গানগুলির একটি বিস্তৃত সংস্কৃত টীকা।

গানগুলিতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদিগের সাধনার সঙ্কেত নিহিত আছে। সে সঙ্কেত আমাদের কাছে এখন প্রায় অবোধ্য। তবে গানগুলির বাহ্যিক যে অর্থ আছে, তাহা জানা বিশেষ দুরূহ নয়। ভাষা কিছু কঠিন বটে, কারণ বাঙ্গালা ভাষা তখন সবেমাত্র প্রাকৃতের খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে।

জয়দেবের কাব্যে এবং বৌদ্ধ গানগুলিতে যে গীতি-কবিতা বা পদাবলীর ধারা সুরু হইল এই ধারা পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব কবিদের কাব্যে অশেষ রস ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান ধারারূপে পরিণত হইয়াছিল। আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও গীতি-কাব্যরূপে এই ধারাই নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে অক্ষুণ্ণ গতিতে চলিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষাব জন্ম-মুহূর্ত্তেই যে তাহার সাহিত্য নিজের মূল ধারা, মূল স্থর, অর্থাৎ গীতি-কাব্য, খুঁজিয়া পাইয়াছিল, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাহা না হইলে বোধ হয় আজ বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

২

তুর্কী অভিযানের পরে

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালা দেশে তুর্কী আক্রমণ সুরু হয়। বাঙ্গালা দেশ চিরদিনই আর্য্যাবর্ত্তের রাষ্ট্রীয় সংঘাতের বাহিবে থাকিয়া নিজের স্বতন্ত্র পথে চলিয়া আসিতেছিল। সেই কারণে, আর্য্যাবর্ত্তে যখন শক হূণ প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকাবিগণ প্রচণ্ড বিক্ষোভ তুলিয়াছিল, তখন তাহার ঢেউ বাঙ্গালা দেশের সীমানায় পৌছিয়া বাঙ্গালীর পল্লীজীবনের সুখশান্তির বিন্দুমাত্রও ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে নাই। অনেক কাল পরে যখন তুর্কী ও পাঠান সৈন্য পশ্চিম ও উত্তর ভারতে একে একে দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখনও এই ব্যাপারের গুরুত্ব বাঙ্গালীর বোধগম্য হয় নাই। অতএব যখন মুহম্মদ-বিন্ বখ্‌তিয়াব মগধদেশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া অকস্মাৎ পূর্ব্বদিকে প্রধাবিত হইল, তখন বাঙ্গালা দেশের রাজশক্তি অথবা প্রজাবর্গ কেহই এই বিদেশী আক্রমণকারীদিগকে উপযুক্ত বাধা দিবার জন্য এতটুকুমাত্রও প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং মুষ্টিমেয় তুর্কী-পাঠান সৈন্যকে বাঙ্গালা দেশে বিশেষ কোন যুদ্ধ অথবা অন্য প্রকার বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙ্গালীর বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চ্চার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। প্রায় আড়াই শত বৎসরের মত দেশ সকল দিকেই পিছাইয়া পড়িল। দেশে শান্তি নাই, সুতরাং সাহিত্যচর্চ্চা ত হইতেই পারে না। প্রধানতঃ এই কারণেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ এই দুই শতাব্দীতে কোন সাহিত্যিক রচনা পাওয়া যায় নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শম্‌সু-দ্‌-দীন ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা-পাশ ছেদ কবিয়া বাঙ্গালায় স্বাধীন সুলতান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তখন হইতেই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার মত অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইল। দেশে পুনরায় জ্ঞানচর্চ্চা সুরু হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টাও দেখা দিল। পাল এবং সেন বংশীয় নরপতিদিগের মত এবারেও মুখ্যভাবে রাজশক্তিই জ্ঞান ও সাহিত্যচর্চ্চার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ তিন জন সুলতান এবং ষোড়শ শতাব্দীতে অন্ততঃ এক জন সুলতান এবং দুই জন উচ্চপদস্থ মুসলমান রাজকর্ম্মচারী যে নিজেদের সভাকবিদিগের দ্বারা অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করাইয়া ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইতেছে। তুর্কী অভিযানের পর, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত, বাঙ্গালা সাহিত্য প্রধানতঃ গীতিমূলক ছিল। অর্থাৎ বাঙ্গালা কাব্য সাধারণতঃ পড়া বা আবৃত্তি করা হইত না,—মন্দিরা, মৃদঙ্গ ও চামর সংযোগে একাকী বা দলবদ্ধ ভাবে গীত হইত। অতি পূর্ব্বকালে বোধ হয় পঞ্চালিকা বা পুতুল-নাচের সঙ্গে

এই ধরণের কাব্য গীত হইত বলিয়া পরে বাঙ্গালা কাব্যের সাধারণ নাম হইয়াছিল "পাঁচালী"। আর, কাব্যগুলিতে কোন না কোন দেবতার অথবা দেবকল্প মানুষের মহিমা কীর্ত্তিত হইত। এই জন্য কাব্যেব নামে প্রায় "মঙ্গল" বা "বিজয়" শব্দ যুক্ত থাকিত।

অনেকে ধাবণা করিয়া থাকেন যে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে "মঙ্গল" ও "বিজয়" কাব্য বলিয়া দুই স্বতন্ত্র প্রকারের কাব্যধারা বর্ত্তমান ছিল। এই ধাবণা নিতান্তই ভুল। একই কাব্যের বিভিন্ন পুঁথিতে কখনও "মঙ্গল" কখনও বা "বিজয়" নাম পাইতেছি। যেমন, মালাধব বসুর কাব্য শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এবং গোবিন্দমঙ্গল এই তিন নামেই সমান ভাবে সুপবিচিত ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীব শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের সাহিত্যিক রুচির চমৎকার ছবি পাওয়া যায় বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে। বৃন্দাবন-দাস লিখিয়াছেন যে, তখন গায়কেরা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও শিবের গৃহস্থালীর গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত, পূজা উপলক্ষে সাধাবণ লোকে আগ্রহ করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ও বিষহরি অর্থাৎ মনসার পাঁচালী শুনিত, এবং রামায়ণ-গানে আব ঐতিহাসিক-গাথায় সাধারণ লোকের, এমন কি বিদেশী মুসলমানেরও চিত্ত বিগলিত হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত এই সব কাব্যের দুই একখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক-গাথাগুলি—বৃন্দাবন-দাসের কথায় "যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত"—একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পঞ্চদশ শতাব্দী

৩

কৃত্তিবাস ওঝা ও মালাধর বসু

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আমরা একজন বড় কবিকে পাইতেছি। ইনি কৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি প্রধান কাব্য। কাব্যটি রচিত হওয়ার পর হইতেই যেরূপ অভূতপূর্ব্ব সমাদর লাভ করিয়া আসিয়াছে তাহা এক কাশীরাম-দাসের মহাভারত কাব্য ছাড়া আর তৃতীয় কোন বাঙ্গালা কাব্যের অদৃষ্টে ঘটে নাই। কৃত্তি-বাসের রামায়ণ শুধু কাব্যরস যোগাইয়া বাঙ্গালীর শ্রবণ মন তৃপ্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, এই অনবদ্য কাব্যের মধ্য দিয়া সমগ্র বাঙ্গালা দেশের তাবৎ নরনারী এই ছয় শত বৎসর ধরিয়া নৈতিক শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। রামায়ণের শান্ত-করুণ কাহিনী শুনিলে এমন কঠিনহৃদয় ব্যক্তি নাই যাহার চিত্ত তৎক্ষণাৎ আর্দ্র হইবে না। এরূপ কাব্য আহার এবং ঔষধ দুইই; একাধারে জনসাধারণের চিত্তবিনোদন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে শ্রোতা ও পাঠকের চরিত্রগঠনে সহায়তা করিয়া থাকে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য। সেকালে শুধু হিন্দুদিগের নিকট নহে, মুসলমানদিগের নিকটেও যে এই কাব্য

বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছিল, একথা বৃন্দাবন-দাস একাধিকবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

কৃত্তিবাস স্বীয় কাব্যে যে আত্মবিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে যাহা জানা যায়, তাহা সংক্ষেপে এই। কৃত্তিবাসের এক পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে বসতি করেন। ইহাব এক পৌত্র মুরারি ওঝা। মুরারিব সাত পুত্র, তাহার মধ্যে একজন বনমালী। এই বনমালীই কৃত্তিবাসের পিতা। কৃত্তিবাসের মাতার নাম মালিনী। ইহাবা ছয় ভাই ছিলেন, আব এক বৈমাত্র ভগিনী ছিল। কৃত্তিবাসের জন্ম হয় মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দিন ববিবারে। বার বৎসর বয়সের সময় কৃত্তিবাস উত্তরদেশে পদ্মাপারে পড়িতে যান। সেখানে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গেলেন বাঙ্গালা দেশেব বাজধানী গৌড়ে। রাজার খাতিব না পাইলে তখন যত বড় পণ্ডিত হউক না কেন, তেমন সমাদর হইত না। সুতরাং কৃত্তিবাস রাজবাড়ীতে গিয়া পাঁচটি শ্লোক রচনা কবিয়া দ্বাবীর হস্তে রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তখন মাঘ মাস, গৌড়েশ্বর পাত্রমিত্র লইয়া প্রাসাদের ভিতরে প্রাঙ্গণে বৌদ্র পোহাইতেছেন। বাজা শ্লোক পড়িয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কৃত্তিবাসকে নিকটে আনাইলেন। রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃত্তিবাস তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে সাতটি শ্লোক রচনা করিয়া রাজাকে অভিবাদন ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। কৃত্তিবাসের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে বিধিমতে সংবর্দ্ধিত করিলেন। সভাসদেরা কৃত্তিবাসকে অনুরোধ করিলেন রাজার নিকট মোটা রকম কিছু পুরস্কার চাহিতে। কৃত্তিবাস ব্রাহ্মণ পণ্ডিত,

তিনি সহজে দান গ্রহণ করিবেন কেন? তিনি সগর্ব্বে উত্তর করিলেন যে, তিনি কাহারও দান গ্রহণ করেন না, কেবল গৌরবটুকু গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। কৃত্তিবাসের লোভ-হীনতায় রাজা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ-কাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। গৌড়েশ্বরের আদেশ পাইয়া কৃত্তিবাস সাতকাণ্ড রামায়ণ-পাঁচালী রচনা করেন।

কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু রাজসভার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা, এবং সভাসদ্‌গণের নাম হইতে বোঝা যায় যে, গৌড়ের সিংহাসনে তখন কোন হিন্দু রাজা উপবিষ্ট ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কংস বা গণেশ ছাড়া অন্য কোন হিন্দু রাজা গৌড়েশ্বর হন নাই। সুতরাং কৃত্তিবাস রাজা গণেশের দ্বারাই আদিষ্ট হইয়া রামায়ণ-কাব্য রচনা কবিয়াছিলেন, এই অনুমান অসঙ্গত নহে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কৃত্তিবাস তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং এই কাব্যের ভাষা পুরানো হইবার কথা। কিন্তু কাব্যটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়াতে লোকের মুখে মুখে ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া একেবারে আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য ভেজালও যে কিছু কিছু না ঢুকিয়াছে, এমন নহে।

রাজা কংস বা গণেশের পুত্র যদু বিশেষ কোন কারণে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া জলালু-দ্-দীন মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করেন। গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনিও হিন্দু কবি ও পণ্ডিতদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় পরাঙ্মুখ হন নাই। যদুর অনুগৃহীত পণ্ডিতদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন

বৃহস্পতি মহিন্তা। ইনি বলিয়াছেন যে, "গৌড়াবনীবাসব" জলালু-দ্-দীনের নিকট হইতে তিনি পর পর এই সাতটি উপাধি পাইয়াছিলেন—আচার্য্য, কবিচক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত-সার্ব্বভৌম, কবিপণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য্য, রাজপণ্ডিত, রায়-মুকুটমণি। শেষের উপাধি দিবার সময় রাজা খুব ধূমধাম করিয়াছিলেন, তাঁহাকে হাতী, ঘোড়া, ছাতা ও বহু রত্নালঙ্কার দেওয়া হইয়াছিল।

জলালু-দ্-দীনের পর কিছু কাল পর্য্যন্ত গৌড়ের সুলতান-দিগের বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় বড় কিছু মেলে না। সে যুগে রাজকার্য্য প্রধানতঃ উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। রাজা ও সুলতানদিগের মত দরবারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরাও সাহিত্য ও শাস্ত্র-চর্চ্চার পোষকতা করিতেন। ইঁহারা কবি-পণ্ডিতগণের উৎসাহদাতা ত ছিলেনই, উপরন্ত নিজেরাও সুযোগ ও যোগ্যতা-মত কাব্য রচনা করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের শেষের দিকে এক রাজকর্ম্মচারী কবি গৌড়েশ্বরের সংবর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বর্দ্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু। ইনি সুলতান রুকনু-দ্-দীন বার্বক শাহের নিকট "গুণরাজ খান" উপাধি পাইয়াছিলেন। রুকনু-দ্-দীন বার্বক শাহের রাজ্যকাল ১৪৬০ হইতে ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ১৩৯৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৭৩ বা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মালাধর এক কৃষ্ণলীলা-কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দীর্ঘ সাত বৎসর পরে ১৪০২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮০ বা ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই কাব্য, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, সমাপ্ত হয়। যতদূর জানা গিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিজয় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক প্রথম

মঙ্গল কাব্যেই হোসেন শাহেব সপ্রশংস উল্লেখ বহিয়াছে। কাব্য দুইটিব পবিচয দিবাব পূর্ব্বে মনসামঙ্গল কাহিনীব কিছু পবিচয় দিতেছি।

বাঙ্গালা দেশে সর্পদেবতা মনসাব পূজা বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে মনসা-পূজাব সমাদব নিম্নশ্রেণীব লোকেব মধ্যেই বেশী ছিল। সে যুগে উচ্চবর্ণেব লোকেবা মনসাদেবীকে বিশেষ আমল দিতেন বলিযা বোধ হয় না। মনসা-পূজাব সময় মনসাদেবীব মাহাত্ম্যখ্যাপক গীত বা পাঁচালী গাওযা হইত। এই পাঁচালীব কাহিনী কোন পুবাণে নাই, ইহা বাঙ্গালাদেশেব নিজস্ব গল্প। এই গল্প সব মনসামঙ্গল কাব্যে একই ভাবে বর্ণিত হইযাছে। গল্পটি মোটামুটি এই।

শিবেব কন্যা মনসা অস্থানে ভূমিষ্ঠ হইবাব অল্পক্ষণ মধ্যেই দৈহিক বৃদ্ধিলাভ কবিযা পূর্ণবযস্কা নাবী হইযা উঠিলেন এবং সর্পদিগেব আধিপত্য লাভ কবিলেন। শিব তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলে শিবগৃহিণী চণ্ডী ঈর্ষান্বিতা হন। ফলে মনসা ও চণ্ডীর মধ্যে দাকণ বিবাদ উপস্থিত হইল, এবং পবস্পব হাতাহাতিব ফলে মনসাব একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। চণ্ডীর উপব নিদাকণ ক্রোধ লইযা মনসা পিতৃগৃহ পবিত্যাগ কবিলেন। কিছুকাল পবে জবৎকাক মুনিব সহিত মনসার বিবাহ হইল। জবৎকাকব ঔবসে মনসাব গর্ভে আস্তীকেব জন্ম হইল।

জনমেজযেব পিতা সম্রাট পবীক্ষিৎ সর্পদংশনে দেহত্যাগ কবেন। পিতৃহত্যাব প্রতিশোধ লইবাব জন্য জনমেজয় সর্পসত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, কেন না এই যজ্ঞ সমাপন

হইলে জগতের সমস্ত সর্প বিনষ্ট হইবে। সর্পেরা বিপদ বুঝিয়া মনসার শরণ লইল। মনসা আস্তীককে জনমেজয়ের যজ্ঞস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। আস্তীক বুঝাইয়া শুঝাইয়া জনমেজয়কে যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত কবিলেন। কতক সাপ রক্ষা পাইয়া গেল। এই আখ্যায়িকাটুকু হইতেছে পুবাণের কথা।

এদিকে চণ্ডীব নিকট মনসা যে অপমান পাইয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলিতে পাবিতেছেন না। উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবাব একমাত্র পন্থা হইতেছে শিব ও চণ্ডীব ভক্তদিগের নিকট হইতে পূজা আদায়। তাহাব পূর্ব্বে আবশ্যক লোক-সমাজে মনসাব পূজা প্রচাব কবা। মনসা প্রথমে এই কাজে মন দিলেন। ইহাতে তাঁহাব পরম সহায় হইল সহচরী নেত্রবতী বা নেতা। অল্প আয়াসেই মনসা ক্রমে ক্রমে রাখাল বালক, জালিয়া এবং দবিদ্র মুসলমানদিগের নিকট পূজা আদায় কবিতে সমর্থ হইলেন। তখন তাঁহার মন হইল যাহাতে সমাজের উচ্চস্তবে তাঁহার পূজা প্রচলিত হয়। সে সময়ে গন্ধবণিকেরা সমাজে বেশ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিল। এই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিল বণিক চন্দ্রধব বা চাঁদ বেনে। নেতা ছদ্মবেশে আসিয়া চাঁদের পত্নী সনকাকে মনসার পূজা শিখাইয়া দিল। একদিন স্ত্রীকে মনসা-পূজা করিতে দেখিয়া চাঁদ ক্রুদ্ধ হইল এবং পূজার দ্রব্য ইত্যাদি সব লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। কিছুতেই চাঁদ বাগ মানিতেছে না দেখিয়া মনসা তাহাকে শাস্তি দিয়া বশে আনাইতে সঙ্কল্প করিলেন। চাঁদের ছয় পুত্র মূল্যবান পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্য হইতে ফিরিতেছিল। মনসার কোপে সেই সাত পুত্র পণ্যদ্রব্য

সমেত সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। চাঁদ তাহাতেও দমিবার পাত্র নহে। তাহার "মহাজ্ঞান" আছে, তাহার বলে চাঁদ সাত পুত্রকে বাঁচাইল। মনসা তখন হীন ছলনা করিয়া চাঁদের "মহাজ্ঞান" হরণ করিয়া লইলেন। তখন আর চাঁদ তাহার ছয় পুত্র ও ধন সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিল না। নিঃস্ব, কৌপীনমাত্র সম্বল হইয়া চাঁদ বাণিজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল। তখন চাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীন্দর বা লক্ষ্মীন্দ্র ("লখিন্দর") বড় হইয়াছে। খুব ধুমধাম করিয়া বিপুলা বা বেহুলার সহিত লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ হইল। চাঁদ বেনের অশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও লৌহনির্ম্মিত অচ্ছিদ্র বাসরঘরে লক্ষ্মীন্দর সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল। চাঁদ বেনের এখন সত্য সত্যই সর্ব্বনাশ হইল।

বিপুলা বয়সে বালিকা হইলেও বুদ্ধি, ধৈর্য্য এবং সতীত্ব গুণে প্রাপ্তবয়স্কা রমণী অপেক্ষাও তেজীয়সী ছিল। সে মনে মনে সংকল্প করিল, 'প্রাণ যায় যাউক, স্বামীকে বাঁচাইতে হইবে। সর্পদষ্ট মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিতে নাই, সাধারণতঃ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। বিপুলা একটি ছোট ভেলার উপর স্বামীর মৃতদেহ লইয়া উঠিল, এবং বাঁকা নদীর স্রোতের মুখে ভেলা ভাসাইয়া দিল। আত্মপরিজন কাহারও প্রবোধ ও নিষেধ বাক্যে কর্ণপাত করিল না। শাখা নদীর স্রোত বাহিয়া ভেলা গঙ্গার দিকে চলিল। পথে নানা প্রলোভন ও ভীতি বিপুলাকে টলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিপুলার মন অচল অটল রহিল।

ত্রিবেণীর নিকটে গঙ্গা-সঙ্গমে পড়িয়া বিপুলা একটি অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। এক ধোপানী শিশু

সন্তান লইয়া কাপড় কাচিতে আসিয়াছে। সে প্রথমে তাহার ছেলেকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়া তাহার পর কাপড় কাচিতে লাগিল। আর সন্ধ্যাবেলায় ফিরিবার পূর্ব্বে ছেলেটিকে পুনর্জীবিত করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া বিপুলা ভাবিল যে, এ মেয়ে ত সামান্য নহে, ইহার সাহায্যেই হয়ত তাহার স্বামীর পুনরুজ্জীবন হইবে। পরদিন ধোপানী আসিলে বিপুলা বিনীতভাবে তাহার সহিত আলাপ করিয়া তাহার হইয়া কিছু কাপড় কাচিয়া দিল। পরিচয়ে জানিতে পারিল যে, এই ধোপানী স্বর্গের দেবতাদিগের কাপড় কাচে, ইহারই নাম নেত্রবতী বা নেতা, ইনি মনসার সহচরীও বটেন। নেতা বিপুলার উপর খুশী হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে রাজী হইল। বিপুলা নেতার সহিত স্বর্গে গেল, এবং সেখানে সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় দক্ষতা দেখাইয়া দেবতাগণকে পরম পরিতুষ্ট করিল। দেবতারা বিপুলার দুঃখের কাহিনী শুনিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ত হাত নাই! অবশেষে তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এবং বিপুলার কাতরোক্তিতে মনসার ক্রোধ প্রশমিত হইল। বিপুলা তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হউক শ্বশুরকে দিয়া মনসার পূজা করাইবে। মনসা লক্ষ্মীন্ধরের অস্থি-অবশিষ্ট দেহে প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিলেন এবং ওদিকে পণ্যসম্ভার-সমেত চাঁদের বড় ছয় ছেলেকেও বাঁচাইয়া দিলেন। বিপুলা ও লক্ষ্মীন্ধর দেশে প্রত্যাগমন করিল। আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে আত্মীয় পরিজনের সহিত মৃত্যুকবল হইতে প্রত্যাগত লক্ষ্মীন্ধর এবং নারীরত্ন বিপুলার মিলন হইল। মনসার পূজা করিতে এখন আর চাঁদ বেনের কোনই আপত্তি রহিল না।

মনসার গীত পূর্ব্বাবধি প্রচলিত থাকিলেও, সব চেয়ে পুরানো মনসামঙ্গল যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার রচনা সম্ভবতঃ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরু হইয়াছিল। সন তারিখের সঙ্গে কবি হোসেন শাহেরও নাম করিয়াছেন। কবির নাম বিজয় গুপ্ত। বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী (এখন গৈলা) গ্রামের এক বৈদ্যবংশে কবির জন্ম হয়। কবির পিতার নাম সনাতন, মাতার নাম রুক্মিণী। ১৭১৬ শকাব্দের শ্রাবণ মাসে রবিবার মনসা-পঞ্চমীর দিনে কবি স্বপ্ন দেখেন যে, দেবী মনসা তাঁহাকে মনসামঙ্গল পাঁচালী রচনা করিতে আদেশ করিতেছেন। তদনুসারে কাব্যটি রচিত হয়। বিজয় গুপ্ত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মনসামঙ্গল-রচয়িতা কবি "কাণা" হরিদত্তের নাম করিয়াছেন। একটিমাত্র পদ ছাড়া হরিদত্তের কাব্যের চিহ্ন এখন লোপ পাইয়াছে।

বিজয় গুপ্তের কাব্যরচনার এক বৎসর পরেই, অর্থাৎ ১৪১৭ শকাব্দে বা ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে, ব্রাহ্মণ কবি বিপ্রদাস পিপিলাই এক মনসামঙ্গল কাব্যের পত্তন করেন। ইনিও হোসেন শাহের নাম করিযাছেন,——"নৃপতি হোসেন শাহা গৌড়ের প্রধান।" বিপ্রদাসের নিবাস ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার উত্তর-পূর্ব্বাংশে বসিরহাট মহকুমায় নাদুড়্যা-বটগ্রাম। কবির পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। কবিরা তিন চারি ভাই ছিলেন। বিপ্রদাসও স্বপ্নে মনসাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন।

কাব্য হিসাবে বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাসের রচনা উচ্চশ্রেণীর নহে। তবে বিপ্রদাসের কাব্যে ঐতিহাসিকের পক্ষে অনেক মূল্যবান তথ্য নিহিত আছে। বিজয় গুপ্তের কাব্য সম্পূর্ণ

ভাবে পাওয়া যায় নাই, যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও অনেক ভেজাল ঢুকিয়াছে।

হোসেন শাহের একজন কর্ম্মচারী যশোরাজ খান একখানি কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইনিও স্বীয় কাব্যে সুলতানের নাম করিয়াছেন।

হোসেন শাহের এক সেনাপতি ("লস্কর") চট্টগ্রাম জয় করিয়া এই অঞ্চল জাগীর রূপে প্রাপ্ত হন এবং তথায় শাসন-কর্ত্তারূপে বসতি করেন। ইঁহার নাম পরাগল খান। ইনি স্বীয় সভাসদ কবীন্দ্রের দ্বারা বাঙ্গালায় "ভারত-পাঁচালী" অর্থাৎ মহাভারত কাব্য রচনা করাইয়াছিলেন। কাব্যটির নাম পাণ্ডব-বিজয় বা বিজয়পাণ্ডবকথা। লস্কর পরাগল খান মহাভারত-কথায় এতদূর অনুরক্ত ছিলেন যে, কবীন্দ্রের কাব্য তাঁহার সভায় প্রত্যহ পঠিত হইত। এইটিই বাঙ্গালায় রচিত সর্ব্ব-প্রাচীন মহাভারত কাব্য। কবির নাম সত্যসত্যই কবীন্দ্র ছিল, কি ইহা তাঁহার উপাধি ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, কবির নাম ছিল পরমেশ্বর। কবীন্দ্রের কাব্য ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে।

পরাগল খানের পুত্র—যিনি "ছুটি খান" অর্থাৎ ছোট খাঁ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন—ইনিও বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। ছুটি খান কবি শ্রীকর নন্দীকে দিয়া মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের বিস্তৃততর অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কবীন্দ্রের কাব্যে সকল পর্ব্বের কথাই খুব সংক্ষেপে দেওয়া আছে। অশ্বমেধ পর্ব্বের গল্প ছুটি খানের খুব ভাল লাগিত বলিয়া তিনি বেশী করিয়া শুনিতে চাহিয়াছিলেন।

ছুটি খান হোসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহের সেনাপতি ছিলেন। সুতরাং শ্রীকর নন্দীর কাব্যে নুসরৎ শাহের রাজ্য কালে—অর্থাৎ ১৫১৮ হইতে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে, সম্ভবতঃ শেষের দিকেই--রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দী একই ব্যক্তি।

হোসেন শাহের পুত্র নসীরু-দ্-দীন নুসরৎ শাহ্ও বাঙ্গালা কাব্যের সমাদর করিতেন। ইঁহার এক কর্ম্মচারী শ্রীখণ্ড-নিবাসী কবিরঞ্জন তখনকার সময়ের একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। বিদ্যাপতির ধরণে ইনি অনেক ভাল ভাল পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে "ছোট বিদ্যাপতি" বলিত। কবিরঞ্জন একটি পদে সুলতানের নাম করিয়াছেন।

নসীরু-দ্-দীন নুসরৎ শাহের পুত্র 'অলাউ-দ্-দীন ফীরূজ শাহ্ পিতা এবং পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। কবি শ্রীধর ইঁহারই আদেশে বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ফীরূজ শাহ্ ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অল্প কয়েক মাসের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কাব্যটি যখন লেখা হয় তখনও তিনি সুলতান হন নাই। সুতরাং শ্রীধরের কাব্যের রচনা-কাল ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই হইবে।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, হোসেন শাহী আমলেই ঘটিয়াছিল। সে কথা পরে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে।

৫

বড়ু চণ্ডীদাস ও তাঁহার কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

চণ্ডীদাস ভণিতায় বহু বৈষ্ণব পদ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে প্রচলিত আছে। এই পদগুলিব মধ্যে অনেকগুলি পুরানো পুঁথিতে অন্য কবিব নামে পাওয়া যায়। পদগুলির মূল্যও একবকম নহে। কতকগুলি খুবই উৎকৃষ্ট। আবার কতকগুলি অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অতি বাজে কবিব বচনা। ইহা হইতে সাধাবণ ধাবণা হইয়াছে যে, চণ্ডীদাসেব নামাঙ্কিত পদগুলি এক ব্যক্তিব এবং এক সময়েব বচনা নহে।

এই ধাবণা যে অযথার্থ নহে, তাহার প্রমাণ মিলিল ১৩১৬ সালে। ঐ সময়ে শ্রীযুক্ত বসন্তবঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলায় পুরানো পুঁথিব খোঁজ করিয়া বেড়াইতে-ছিলেন। তিনি বনবিষ্ণুপুবেব নিকটবর্ত্তী কাঁকিল্যা গ্রামে এক.ভদ্র গৃহস্থেব গোশালার মাচায় কতকগুলি পুঁথি পান, তাহার মধ্যে একটি পুঁথি দেখিয়াই তাঁহাব মনে হইল, এত প্রাচীন পুঁথি তিনি ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই। পুঁথি পড়িয়া তিনি দেখিলেন যে, এটি একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য। ইহাব বচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। কাব্যের ভাষা অত্যন্ত পুবানো ধবণেব, এবং গল্পেও অনেক নূতনত্ব আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পুঁথিটি খণ্ডিত ; গোড়ার একখানি এবং মধ্যেব ও শেষের কয়েকখানি পাতা নাই। প্রথম পাতাখানি না থাকায় কাব্যের নাম কি ছিল তাহাও জানা গেল না।

১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে কাব্যটি প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত হইবামাত্র পণ্ডিত এবং সাহিত্যরসিক সমাজে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। এত প্রাচীন ভাষা, বৌদ্ধ গান ও দোহা ছাড়া, অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। এত প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিও ইহার পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। কাব্যের গল্পাংশে ও বর্ণনাতেও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। এতদিনে চণ্ডীদাসের মূল কাব্য পাওয়া গেল বলিয়া প্রাচীন সাহিত্যমোদিগণ পুলকিত হইলেন; বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের আলোচনা করিবার উপাদান মিলিল বলিয়া ভাষাবিজ্ঞানবিদেরা উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু কিছু বিতণ্ডারও যে সৃষ্টি হইল না, তাহা নহে। এই বিতণ্ডা আজিও সম্পূর্ণরূপে মিটে নাই। যাঁহারা এখনকার দিনে আধুনিক ভাষায় চণ্ডীদাসের পদ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা বলিলেন, এই বিকট ভাষায় লেখা পদ চণ্ডীদাসের হইতেই পারে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য এখনকার বিচারে স্থানে স্থানে রুচিবিগর্হিত বলিয়া বোধ হয়। এই সূত্র ধরিয়া আবার অনেকে বলিলেন, এ কাব্য নিতান্ত অশ্লীল; শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের যে পদ আস্বাদন করিতেন সে পদ এ কবির রচনা হইতেই পারে না।

কিন্তু এই চণ্ডীদাসই যে চণ্ডীদাস ভণিতার শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা হওয়া সম্ভব, তাহার একটি অবাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একটি ভাল পদ রূপান্তরিত ভাষায় প্রচলিত কীর্ত্তন-পদাবলীর মধ্যে ধরা পড়িল। আর শ্রীচৈতন্যের সময়ে যে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য অজ্ঞাত ছিল না, তাহারও প্রমাণ মিলিতে বিলম্ব হইল না।

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পারিষদ সনাতন গোস্বামী তাঁহার রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় একস্থানে চণ্ডীদাস-বর্ণিত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড লীলার উল্লেখ করিয়াছেন; এই দুই লীলা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেই মুখ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে কবির সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, কবির নাম অথবা উপাধি ছিল বড়ু চণ্ডীদাস, আর ইনি ছিলেন দেবী বাসলীর সেবক। কয়েকটি পদের শেষে "অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস" এই ভণিতা আছে। এখানে "অনন্ত" এই নামটি লিপিকার অথবা গায়কের প্রক্ষেপ বলিয়াই অনুমান হয়। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ-কথা ও গালগল্প প্রচলিত আছে। এক প্রবাদের মতে, ইঁহার জন্মস্থান ছিল বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রাম; অপর প্রবাদের মতে, ইনি ছিলেন বাঁকুড়ার নিকটবর্ত্তী ছাতনা গ্রামের অধিবাসী। প্রবাদে আরও বলে যে, ইঁহার এক রজকজাতীয়া সাধনসঙ্গিনী ছিলেন। এই মহিলার নাম সম্বন্ধেও বিভিন্ন প্রবাদের মধ্যে ঐকমত্য নাই;—এক মতে ইঁহার নাম ছিল তারা, অপর মতে রামতারা এবং তৃতীয় মতে রামী। এই সব প্রবাদ আংশিকভাবেও সত্য কিনা, তাহা যাচাইয়া লইবার মত কোন উপাদান এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের রচনাকাল জানা নাই। তবে পুঁথির লেখা দেখিয়া এপিগ্রাফিস্ট্ অর্থাৎ প্রাচীনলিপিবিশারদেরা বলেন যে, পুঁথিটি আনুমানিক ১৪৫০ হইতে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে লিখিত হইয়াছিল। পুঁথিটিতে তিন হাতের লেখা আছে এবং ভুলভ্রান্তিও কিছু কিছু আছে। সুতরাং ইহা কবির নিজের লেখা বা মূল পুঁথি নিশ্চয়ই নহে।

পুঁথিটি কবির সময়ে লিখিত হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লইলেও কাব্যের রচনাকাল ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে হয়। মনে হয়, কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে কিংবা তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

বড় চণ্ডীদাসের কাব্যে একমাত্র রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনীই চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের জন্ম ও গোকুলে আনয়ন, এবং কালিয়দমন—শুধু এই দুইটি বিষয় প্রচলিত পুরাণ হইতে লওয়া হইয়াছে। অপর লীলাকাহিনী-গুলি শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ বা হরিবংশ ইত্যাদি কোন পুরাণে—যেখানে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে—সেখানে নাই। কাব্যটির মধ্যে কবিত্বের উচ্ছ্বাস বা অলঙ্কারবাহুল্য এসব বড় কিছু নাই। তবুও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতা যে খুব উঁচুদরের কবি ছিলেন, তাহা প্রমাণিত হয় রাধার চরিত্র-বর্ণনা হইতে। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে রাধার চরিত্র যেরূপ উজ্জ্বল ও জীবন্ত, এমনটি আর কোন প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে দেখা যায় নাই। কাব্যটিতে কিছু কিছু অশ্লীলতা-দোষ থাকিলেও ইহার রচয়িতা যে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদিগের অন্যতম, ইহা স্বীকার করিতেই হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ষোড়শ শতাব্দী

৩

চৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রভাব

শ্রীচৈতন্য যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন দেশে রাজনৈতিক অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকে শাসনকার্য্যের কোন না কোন বিভাগে চাকুরী করিতেন; ইঁহাদের দ্বারা সমাজে কিছু কিছু স্বেচ্ছাচার আমদানী হইতে লাগিল। সাধারণ লোকের মধ্যেও আচার-বিচারে যথেষ্ট পরিমাণে শিথিলতা দেখা দিল। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অনেকে ভয়ে, ভক্তিতে বা সুবিধামত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। যে শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম্ম ও আচারনিষ্ঠা অবিচলিত রহিয়া গেল,—তাহা হইতেছে ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়। ইঁহারা সাংসারিক হিসাবে দরিদ্র; লাভলোভ ইহাদের বড় কিছু ছিল না; সুতরাং রাজশক্তির আনুকূল্যের কোনই ভরসা ইঁহারা রাখিতেন না। কিন্তু ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ধনী ব্যক্তিরা বিদ্যাচর্চ্চার বিষয়ে ক্রমশঃ উদাসীন হইয়া পড়াতে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সংখ্যাও কমিয়া আসিতে লাগিল। সেন বংশের

সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল বলিয়াই হউক, অথবা অন্য কোন কারণে হউক, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নবদ্বীপ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান হইয়া দাঁড়াইল এবং অনতিবিলম্বে বাঙ্গালা দেশেব প্রধানতম বিদ্যাকেন্দ্র হইয়া উঠিল। বাঙ্গালা দেশের বলি কেন, এক বিষয়ে নবদ্বীপ সারা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র ছিল। তাহা হইতেছে নব্যন্যায়শাস্ত্র। সূক্ষ্ম ন্যায়-দর্শনশাস্ত্রের চরম বিকাশ প্রধানতঃ নবদ্বীপেই হইয়াছিল।

নবদ্বীপ সেকালে ছোট জায়গা ছিল না; বহু গ্রামের সমষ্টি লইয়া ইহা ছিল একটি বিরাট শহরের মত। কিছু দূরে শান্তিপুর, তাহাও পণ্ডিতপ্রধান স্থান ছিল। গঙ্গার উভয়তীব ধরিয়া আরও অনেকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, সেগুলি নবদ্বীপের অবনতির পর হইতে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে।

নবদ্বীপের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয় ১৪০৭ শকাব্দে--অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে—ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার দিন। ইহার পিতা ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচী দেবী। শ্রীচৈতন্যের নামকরণ হয় বিশ্বম্ভর, ডাক নাম ছিল নিমাই। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া আত্মীয়-স্বজনে তাহাকে গোরা বা গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকিত। শ্রীচৈতন্যের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, বিশ্বরূপ। তিনি অল্প বয়সেই গৃহ-ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কবেন। বাল্যকালে শ্রীচৈতন্য অতিশয় চপল ও দুর্বিনীত ছিলেন, তথাপি পরিচিত অপরিচিত সকলেই এই দুর্ললিত সুন্দর শিশুটিকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারিত না। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কিছুকাল পরেই শ্রীচৈতন্যের পিতৃবিয়োগ হইল। অল্পবয়সেই শ্রীচৈতন্য

ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া টোল খুলিলেন। তাহার পর লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সহিত বিবাহ হইল। বিবাহের অব্যবহিত পরে তিনি বঙ্গদেশে অর্থাৎ পদ্মাতীরবর্ত্তী অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও প্রচুর প্রতিপত্তি লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিল। দ্বিতীয়বারে শ্রীচৈতন্য বিবাহ করিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে।

পিতৃকৃত্য করিতে গয়ায় গিয়া শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিকতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতেই শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিল। তাঁহার উদ্ধত-স্বভাব, পাণ্ডিত্যের গূঢ় গর্ব্ব একেবারে দূর হইল। তিনি ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িলেন। কিছু কাল পরে স্থৈর্য্য লাভ করিয়া তিনি কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, ভগবৎপ্রসঙ্গ ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া দিন-রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া নবদ্বীপের তাবৎ লোক ভক্তিভাবাপন্ন হইয়া উঠিল। নবদ্বীপের ভক্তিপ্রচার কার্য্যে তাঁহার দুই প্রধান সহায় হইলেন, নিত্যানন্দ এবং হরিদাস।

শ্রীচৈতন্য দেখিলেন যে, শুধু নবদ্বীপে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, সমগ্র বাঙ্গালা দেশ এবং বাঙ্গালার বাহিরেও এই ধর্ম্ম প্রচার করা আবশ্যক, নতুবা বিভিন্ন আচার-ব্যবহার এবং অনাচার-অধর্ম্মে আচ্ছন্ন খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী জনসাধারণ জাতিগত ঐক্যলাভ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না; উপরন্তু সমস্ত দেশ ম্লেচ্ছ হইয়া

যাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সন্ন্যাসী না হইলে ধর্ম্মের কথা লোকে অন্যের নিকট সহজে শুনিতে চাহে না; সুতরাং শ্রীচৈতন্য সংসার ত্যাগ করিয়া কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহাব বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধবনিতা জনসাধারণের মন হরণ করিয়া লইলেন; তাঁহার বিরুদ্ধবাদী দেশে আব কেহ বহিল না।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য পুরীতে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি দেশপর্য্যটনে ও তীর্থদর্শনে বাহির হইলেন। প্রথম বারে তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্য, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট ভ্রমণ কবিলেন। তাহার পব বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে গঙ্গাপথ ধরিয়া শান্তিপুব হইয়া গৌড়ে পৌঁছিলেন। সঙ্গে লোকসংঘট্ট হওয়াতে তিনি সেবার গৌড়ের উপকণ্ঠস্থিত রামকেলী গ্রাম হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বামকেলীতে হোসেন শাহেব মন্ত্রী দবীর-খাস সনাতন ও সাকর-মল্লিক রূপ এই দুই ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের বৈরাগ্য জন্মিল; অল্পকাল পরেই তাঁহারা গৃহত্যাগ করিলেন। তৃতীয় বারে শ্রীচৈতন্য ঝাড়িখণ্ড বা ছোটনাগপুরের অবণ্যময় পথে মথুরা ও বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পথে কাশী, প্রয়াগ ইত্যাদি প্রধান প্রধান তীর্থ পড়িল। প্রয়াগে সাকর-মল্লিক রূপের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ফিবিবার পথে কাশীতে দবীর-খাস সনাতন তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন।

এইরূপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া শ্রীচৈতন্য সর্ব্বজনীন ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিলেন। এই প্রচার তিনি বক্তৃতা বা উপদেশ-বাণীর দ্বারা করেন নাই; তাঁহার অমল লোকোত্তর চরিত্রের প্রভাবেই লোকে তাঁহার আচরিত ধর্ম্ম সানন্দে বরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

তীর্থপর্য্যটন ও গমনাগমনে ছয় বৎসর অতীত হইল। জীবনের শেষ অষ্টাদশ বর্ষ শ্রীচৈতন্য পুরী ছাড়িয়া আর কোথাও যান নাই। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে বাঙ্গালা দেশ হইতে অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রমুখ ভক্তেরা আসিয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইতেন। এই সময় নীলাচলে আনন্দোচ্ছ্বাস বহিত। দিন দিন শ্রীচৈতন্যের ঈশ্বরপ্রেম উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষের কয় বৎসর তিনি একরকম বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া দিব্যোন্মাদে বিহ্বল হইয়া থাকিতেন। অন্তরঙ্গ অনুচর এবং ভক্তেরা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কবিতা ও গান শুনাইয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিয়া রাখিতেন। অবশেষে ১৪৫৫ শকাব্দে—অর্থাৎ ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে—আষাঢ় মাসে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার তিরোভাব হয়। বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা দেশে তাঁহার প্রভাব এতদূর ব্যাপক ও গভীর হইয়াছিল যে, জীবিতকালেই তিনি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্মপ্রচারে সহায়ক হইয়াছিলেন তাঁহার অনুচর ও ভক্তেরা। সেকালের নবদ্বীপ অঞ্চলের এবং অন্যস্থানেরও অনেক আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী মনীষী তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। অন্য সময়

হইলে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া গৃহীত হইতে পারিতেন।

শ্রীচৈতন্যের পারিষদদিগের মধ্যে প্রধান হইতেছেন অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ এবং হরিদাস। অদ্বৈত আচার্য্যের পিতা কমলাক্ষ শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। অদ্বৈত আচার্য্য মহাপণ্ডিত এবং অসাধারণ প্রভাব-শালী ব্যক্তি ছিলেন। শচীদেবী ইঁহার মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জন্মকালে অদ্বৈত আচার্য্যের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরও কয়েক বৎসর ইনি জীবিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্মের বিস্তারের জন্য যাঁহারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের মুখ্য ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ,—ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত আচার্য্য এবং আরও দুই চারি জন। শ্রীচৈতন্য আচার্য্যকে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন। আচার্য্যের দুই পত্নী, শ্রী দেবী ও সীতা দেবী। সীতা দেবী মহীয়সী মহিলা ছিলেন। অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দ আকুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার জন্ম হয় বীরভূমের অন্তর্গত একচাকা গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী। শৈশব হইতেই নিত্যানন্দের ঈশ্বরানুরক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। বাল্যাবস্থায় ইনি এক সন্ন্যাসীর সাহচর্য্যে গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। একস্থানে মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত তাঁহার

সাক্ষাৎ হয়। তিনি পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পর্য্যটন-ক্রমে তিনি অবশেষে বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসেন এবং শ্রীচৈতন্যের কথা শুনিয়া তাঁহাব সহিত মিলিত হইবার জন্য নবদ্বীপে আগমন করেন। নিত্যানন্দেব সহিত মিলিত হইয়া শ্রীচৈতন্য দ্বিগুণ উৎসাহে হবি াম ও ভক্তিধর্ম্ম প্রচারে মন দিলেন। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসেব সময় নিত্যানন্দ সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে পুরীতেও আসিয়া কিছুকাল ছিলেন। তাহার পর শ্রীচৈতন্যের অনুবোধে তিনি বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া বিবাহ করিয়া সংসাবাশ্রমী হইলেন এবং জনসাধাবণের মধ্যে হরিনাম প্রচার কবিতে লাগিলেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের তুই কন্যা বসুধা দেবী ও জাহ্নবী দেবীব সহিত নিত্যানন্দের পবিণয় হয়। বসুধা দেবীর গর্ভে এক কন্যা গঙ্গা দেবী ও এক পুত্র বীবচন্দ্র জন্মগ্রহণ কবেন। শ্রীচৈতন্যেব তিরোধানের কিছুকাল পবে নিত্যানন্দের তিরোধান হয়। তাহার পর তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্য্যা জাহ্নবী দেবী এবং পুত্র বীরচন্দ্র বাঙ্গালী বৈষ্ণবসমাজেব নেতা হন।

হরিদাস অদ্বৈত আচার্য্যেব প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, ইনি মুসলমান পিতামাতার সন্তান; আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইনি হিন্দুর সন্তান, তবে মাতাপিতৃহীন হইয়া মুসলমানের গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া মুসলমান বলিয়া পরিচিত হন। যৌবনকালেই ইনি ভক্তি-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সংসার ছাড়িয়া নিঃসঙ্গ উদাসীন হইয়া দিবাবাত্র হরিনাম জপ করিয়া কাল কাটাইতে থাকেন। মুসলমান হইয়া হিন্দুর আচার করিতে দেখিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিযোগক্রমে কাজী তাঁহাকে হিন্দুয়ানী

ছাড়িতে আদেশ করে। হরিদাস তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তখন তাঁহার উপর অকথ্য নির্য্যাতন চলিল; কিন্তু তাহাতেও হরিদাসের ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশেষে হার মানিয়া কাজী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। হরিদাস ফুলিয়ায় আসিয়া কুটীর বাঁধিলেন। এদিকে মহাপুরুষ বলিয়া তাঁহার নাম জাহির হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার কুটীরে ভিড় জমিতে লাগিল। অগত্যা হরিদাস সেখান হইতে পলাইয়া শান্তিপুরে গেলেন। সেখানে অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহাকে পাইয়া পরম সমাদর করিয়া রাখিলেন। পরে শ্রীচৈতন্যের সহিত হরিদাসের মিলন হইল। হরিদাস এবং নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু নামপ্রচারের ভার দিলেন। ইঁহারা হার মানায়, শ্রীচৈতন্য নিজে প্রভাব বিস্তার করিয়া নবদ্বীপের কোটাল উচ্ছৃঙ্খল ভ্রাতৃদ্বয় জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেন। হরিদাসকে শ্রীচৈতন্য যারপরনাই শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন, সেই কারণে সন্ন্যাসের পর তিনি হরিদাসকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া নীলাচলে রাখিলেন। পুরীতে হরিদাসের দেহত্যাগ হইলে তিনি স্বহস্তে মৃতদেহ সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন এবং নিজে ভিক্ষা করিয়া হরিদাসের নির্বাণ মহোৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপে থাকার সময় শ্রীচৈতন্যের অপরাপর প্রধান অনুচর ছিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার তিন ভাই, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব ঘোষ ও তাঁহার দুই ভাই, গদাধর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত এবং আরও অনেকে।

নীলাচলে অবস্থানকালে তাঁহার প্রধান অনুচর ছিলেন স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়—ইনি পূর্ব্বে উড়িষ্যার রাজার

তরফে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন, গদাধর পণ্ডিত, হরিদাস, জগদানন্দ পণ্ডিত, কাশী মিশ্র, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, পরমানন্দ পুরী এবং রঘুনাথ দাস।

রঘুনাথ দাস ছিলেন সপ্তগ্রামের ধনী জমিদার গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র এবং বংশের একমাত্র সন্তান। ইনি বাল্যে হরিদাসের সংস্পর্শে আসিয়া ভক্তিধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন হন। ইহা দেখিয়া তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত সুন্দরী কন্যা দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন। তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। গৃহ হইতে পলাইবার জন্য রঘুনাথ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা ছাড়া উপায় রহিল না। কিন্তু তিনি "চৈতন্যের বাতুল", তাঁহাকে ঘরে ধরিয়া রাখিবে কে? এক রাত্রিতে প্রহরীর অলক্ষিতে তিনি পলাইলেন। শ্রীচৈতন্য তখন পুরীতে, এ সংবাদ তিনি অবগত ছিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে তিনি পুরী পৌছিলেন বার দিনে, পথে তিন দিন মাত্র ভোজন করিয়াছিলেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত সংবাদ পাইয়া গৃহে আর ফিরিবেন না জানিয়া পুরীতে ভৃত্য, পাচক ও উপযুক্ত অর্থ পাঠাইয়া দিলেন। রঘুনাথ সে সব কিছুই নিজের জন্য লইলেন না; আহারবিহারে কঠোর কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করিলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখিয়া শ্রীচৈতন্য অত্যন্ত প্রীত হইলেন, তাঁহাকে নিজে কিছু উপদেশ দিয়া স্বরূপ দামোদরের হস্তে তাঁহার শিক্ষা ও সাধনার ভার ন্যস্ত করিলেন। শ্রীচৈতন্যের ও স্বরূপ দামোদরের অন্তর্দ্ধানের পর রঘুনাথ বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের আশ্রয়ে আসিয়া রাধা-

কুণ্ডতীরে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এইখানেই ইহার দেহত্যাগ হয়।

সনাতন ও রূপ গোস্বামী বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যের উপদেশ মত বৃন্দাবনে বাস করিলেন। এখানে ইহারা বৈষ্ণব শাস্ত্র রচনা করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন। ইহাদেব প্রভাবে চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম মথুরা অঞ্চলে, পঞ্জাবে, রাজপুতনায় এমন কি সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। পাণ্ডিত্যে এবং প্রতিভায় সনাতন গোস্বামীর সমকক্ষ তখন কেহই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনিই আবার কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামীব দীক্ষাগুরু। সনাতন অত্যন্ত বৈরাগ্যপরায়ণ ছিলেন, ইহার কুটীর ত ছিলই না, উপরন্তু এক বৃক্ষতলে একাধিক রাত্রি যাপন করিতেন না। অথচ পাণ্ডিত্য বা আধ্যাত্মিকতার গর্ব্বের লেশমাত্র ইহার ছিল না। রূপ গোস্বামী পাণ্ডিত্যে এবং কবিত্বশক্তিতে অদ্বিতীয় ছিলেন বলা চলে। গৌড়ে থাকার সময়েই ইনি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক অনেক সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার পর ইনি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক তিনখানি নাটক ও অনেকগুলি কাব্য রচনা করিলেন এবং বৈষ্ণব শাস্ত্র ও বহু প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের পুস্তক বচনা করিলেন। ইহার লেখা সবই সংস্কৃতে। রূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি বই দুইখানি বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

সনাতন ও রূপের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। ইহার নাম ছিল অনুপম বা বল্লভ। ইনি অল্প বয়সেই গতাসু হন। ইহার পুত্র জীব খুল্লতাত রূপ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। ইনিও ছিলেন প্রগাঢ় পণ্ডিত। বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহু দার্শনিক গ্রন্থ ইনি

প্রণয়ন করেন। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর তিরোধানের পর ইনিই বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবসমাজের নেতা হন।

সনাতন, রূপ এবং জীবের কথা বাদ দিলে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহান্তদিগের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস। ইহারা ষট্ গোস্বামী নামে প্রথিত ছিলেন। ইহাদের সঙ্গে লোকনাথ গোস্বামীরও নাম করা উচিত। এই গোস্বামীরাই প্রধানতঃ বৃন্দাবনের তীর্থ সকল প্রকটিত করেন ও প্রধান প্রধান বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা প্রচলিত করেন। সকলেই শ্রীচৈতন্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন।

হিন্দু অহিন্দু, পণ্ডিত মূর্খ, উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে শ্রীচৈতন্য তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাকে ইংরেজি মতে 'রিলিজিয়ন' বা "ধর্ম্ম" বলা বোধ হয় খুব সঙ্গত হয় না, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা বলাই ঠিক হয়। জনসাধারণের জন্য শ্রীচৈতন্য যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজনীন চিরন্তন আদর্শের অনুগত ; জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি-উদ্দীপনের জন্য নামসংকীর্ত্তন—ইহারই উপর শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিচারে সকল মানুষই যে সমান আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইতে পারে, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন। তখনকার দিনের হিন্দুধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়া সমাজে একতা আনিয়া অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিবার পক্ষে শ্রীচৈতন্যের উপদেশ ও প্রভাব অসামান্য সহায়তা করিয়াছিল। অপূর্ব্ব প্রেরণায় উদ্দীপিত হইয়া বাঙ্গালীর প্রতিভা কি ধর্ম্মে, কি দার্শনিক চিন্তায়, কি সাহিত্যে, কি সঙ্গীতকলায় সর্ব্বত্রই বিচিত্র ভাবে স্ফূর্ত্ত হইতে লাগিল। ইহাই বাঙ্গালী জাতির প্রথম জাগরণ।

৭

বৈষ্ণব গীতিকাব্য

রাজা ও রাজকর্ম্মচারিদিগের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্মেষ হইয়াছিল, একথার আলোচনা পূর্ব্বে করিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপূর্ণ উন্মেষ হইল। তাহার পর আড়াই শত তিন শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণবতার ছাপ অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি প্রায় সকলেই বৈষ্ণবসম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন, এবং যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে প্রধান তাঁহারা প্রায় সকলেই শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিকর অথবা পরিকরের শিষ্য বা অনুশিষ্য ছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা চিরন্তন ধারা সেই গীতিকাব্য বৈষ্ণব কবিদিগের দ্বারা বিশেষরূপে অনুশীলিত হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণবগীতি-কাব্যেই প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ প্রকাশ পাইল। এই গীতি-কাব্য শুধু বাঙ্গালা ভাষাতেই রচিত হয় নাই, কিছু কিছু সংস্কৃতে, জয়দেবের অনুকরণে, রচিত হইয়াছিল। কিন্তু বেশীর ভাগই লেখা হইত এক নূতন-সৃষ্ট মিশ্রভাষা ব্রজবুলিতে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। মৈথিল ভাষায় লিখিত ইঁহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতিকবিতা বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যও

বিদ্যাপতির গান শুনিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেন। বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপতির কবিতার ঝঙ্কার ও অলঙ্কারে আকৃষ্ট হইয়া ঐ ভাষায় কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। মৈথিল ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে। সুতরাং তাঁহাদের লেখার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব কিছু না কিছু রহিয়া গেল। মৈথিল এবং বাঙ্গালা মিশ্রিত এই কৃত্রিম ভাষা ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব গীতিকবিতার মুখ্য ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। সাধারণ লোকে মনে করিল যে, দ্বাপর যুগে রাধাকৃষ্ণ সম্ভবতঃ এই ভাষাতেই কথা বলিতেন, ইহাই ছিল ব্রজের বুলি। সুতরাং এই ভাষার নাম হইল ব্রজবুলি, ব্রজের অর্থাৎ বৃন্দাবনের ভাষা। বৃন্দাবনের আধুনিক কথ্যভাষার নাম ব্রজভাষা। ইহা হিন্দীর উপভাষা বিশেষ, ব্রজবুলির সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে, এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও কোন কোন বাঙ্গালী কবি ব্রজবুলিতে কবিতা রচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের শ্রেষ্ঠ রচনা ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি।

বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলিতে শুধু রাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়াই পদ রচনা হইল না। শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী এবং তাঁহার প্রধান প্রধান পারিষদগণের মাহাত্ম্য বিষয়েও প্রচুর গীতি-কবিতা রচিত হইতে লাগিল। দেবতার বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে, বিশেষ করিয়া জীবিত মানুষের উপর, কবিতা রচনা করা বাঙ্গালা সাহিত্যে কেন সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করিল। বাঙ্গালা সাহিত্য এতদিন ছড়াগান, ব্রতকথা ও দেবতার পাঁচালী, বড় জোর রামায়ণ ও

মহাভারতের কাহিনী লইয়াই ব্যাপৃত ছিল: এ ছিল একেবারে "লোক সাহিত্য," ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফোক্-লিটারেচার।' এখন ইহা প্রকৃত সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করিল। সে যুগের পক্ষে এ অসামান্য ঘটনা। শ্রীচৈতন্যের বিষয়ে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথম কবিতা লিখেন তাঁহারা মহাপ্রভুরই পারিষদ ছিলেন। ইহারা হইতেছেন—নরহরি সরকার, বংশীবদন চট্ট, বাসুদেব ঘোষ এবং পরমানন্দ গুপ্ত। শ্রীচৈতন্যের অনুচরদিগের মধ্যে আরও অনেকে কবি ছিলেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ আচার্য্য, রামানন্দ বসু এবং মাধব আচার্য্য।

নরহরি সরকারের বাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ডের বহু ব্যক্তি গৌড়ে রাজদরবারে চাকুরি করিতেন. সেই সূত্রে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই শ্রীখণ্ড সাহিত্যচর্চ্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাড়ায়। নরহরি স্বয়ং, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ, এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন শ্রীচৈতন্যের বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। ইহাদের, বিশেষ করিয়া নরহরি এবং রঘুনন্দনের, প্রভাবে শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবদিগের একটি তীর্থস্থান হইয়া পড়ে। নরহরি শ্রীচৈতন্যের পূজা প্রচারেরও অন্যতম প্রবর্ত্তক। নরহরি এবং রঘুনন্দনের শিষ্যদিগের মধ্য বহু প্রথমশ্রেণীর কবি ছিলেন, যেমন—লোচন দাস, কবিরঞ্জন এবং কবিশেখর রায় উপাধিক দেবকীনন্দন সিংহ।

নিত্যানন্দ এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভার্য্যা জাহ্নবা দেবীর শিষ্যগণের মধ্যে সে যুগের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন—বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস এবং জ্ঞানদাস। অন্যান্য শ্রীচৈতন্য-পারিষদের শিষ্যগণের মধ্যেও বহু কবি পাই—নয়নানন্দ মিশ্র,

শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী, যত্নন্দন চক্রবর্ত্তী, উদ্ধব দাস, দেবকীনন্দন, অনন্তদাস, চৈতন্যদাস, ইত্যাদি।

বৈষ্ণব গীতিকবিরা সচরাচর "পদকর্ত্তা" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পদকর্ত্তাদের মধ্যে কৃষ্ণলীলা বর্ণনায় মুরারি গুপ্ত, লোচন দাস, জ্ঞানদাস এবং বলরামদাস অতুলনীয়। লোচন দাস হাল্‌কা ছন্দের বাঙ্গালা কবিতায় বিশেষ গুণপনা দেখাইয়াছেন। বাৎসল্য রসের বর্ণনায় বলরামদাসের জুড়ি নাই। জ্ঞানদাস বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষার পদেই অসামান্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। বাসুদেব ঘোষের এবং নয়নানন্দ মিশ্রের রচিত শ্রীচৈতন্য-বিষয়ক পদগুলি ভক্তি ও ভাবরসে ভরপুর।

গীতিকাব্য ছাড়া কয়খানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যও এই সময়ে রচিত হয়। মাধব আচার্য্যের কাব্য শ্রীচৈতন্য বর্ত্তমান থাকা কালেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। দেবকীনন্দন সিংহের গোপালবিজয়ের সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অনেকটা মিল আছে। দেবকীনন্দন সংস্কৃতে কৃষ্ণ-লীলাত্মক একখানি কাব্য এবং একটি নাটকও রচনা করিয়া-ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অনুগৃহীত ভক্ত রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এটি পুরাপুরি বর্ণনাত্মক কাব্য।

মাধব আচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাসও একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। আকারে ছোট হইলেও কাব্যটি উৎকৃষ্ট। কৃষ্ণদাসের পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম পদ্মাবতী। ইহাদের নিবাস ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী কোন গ্রামে।

৮
শ্রীচৈতন্য-জীবনী

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমসাময়িক ব্যক্তির জীবনী-কাব্য লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ হইল। শ্রীচৈতন্যের অতিলৌকিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব শুধু তাহার ভক্ত-দিগেরই নহে, সাধারণ লোকেরও সবিস্ময় শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক করিয়াছিল। তাঁহার তিরোধানের বহু পূর্ব্বেই তিনি বৈষ্ণব সমাজে অবতার বলিয়া সম্পূজিত হইয়াছিলেন, এবং শুধু গীতিকবিতায় নহে সুবৃহৎ জীবনীকাব্যেও তাঁহার লীলা-কাহিনী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের বর্ত্তমান কালে যে জীবনীটি রচিত হইয়াছিল তাহা সংস্কৃতে, মহাকাব্যের আকারে, মুরারি গুপ্তের লেখনী-প্রসূত। বাঙ্গালা জীবনী-কাব্য কয়খানি তাঁহার তিরোধানের অল্পবিস্তর পরে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আরও দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবনী বর্ণিত হইয়াছিল। দুইখানিরই রচয়িতা পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর। ইনি শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পারিষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র ছিলেন। একখানি হইতেছে মহাকাব্য—চৈতন্যচরিতামৃত, আর অপরখানি নাটক—চৈতন্যচন্দ্রোদয়।

বাঙ্গালায় শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনী-কাব্য হইতেছে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত। বইটি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে নিত্যানন্দের আদেশে রচিত হইয়া-ছিল। চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনের কাহিনী

সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। বইটি অতিশয় সুখপাঠ্য, পড়িলে মনে হয় যেন গ্রন্থকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। সেকালের নবদ্বীপের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায় চৈতন্যভাগবতে। বৃন্দাবনদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের মুখ্য পারিষদগণের অন্যতম শ্রীবাস পণ্ডিতের এক ভ্রাতার দৌহিত্র এবং নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। বর্ণিত বিষয়ের অধিকাংশই তিনি নিত্যানন্দের মুখে শুনিয়াছিলেন। নিত্যা-নন্দের বাল্যকথা এবং পরবর্ত্তী কীর্ত্তিকলাপও ইহাতে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে।

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবতের পরে রচিত হইয়াছিল, কারণ ইহাতে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। স্বীয় গুরু নরহরি সরকারের আদেশে লোচন কাব্যটি রচনা করেন। লোচনের নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় কোগ্রামে। ইহার পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম অভয়া দাসী। পিতৃ-বংশের ও মাতৃ-বংশের একমাত্র সন্তান ছিলেন বলিয়া বাল্যকালে লোচন শিক্ষার অপেক্ষা আদরই পাইয়াছিলেন অত্যধিক। একটু বেশী বয়সে ইনি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন, তাহাও মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তের নির্ব্বন্ধে।

লোচনের কাব্য মুরারি গুপ্তের শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতের অনুবাদ বলা চলে। জীবনী হিসাবে বিশেষ নূতনত্ব না থাকিলেও লোচনের চৈতন্যমঙ্গল কাব্য হিসাবে অতিশয় উপাদেয়। পাঁচালী গান বলিয়া চৈতন্যমঙ্গল বরাবর সমাদর লাভ করিয়া আসিয়াছে।

শুধু শ্রীচৈতন্যের শ্রেষ্ঠ জীবনী বলিয়াই নহে, উচ্চস্তরের দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত

বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিলে বেশী বলা হয় না। কৃষ্ণদাসের নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটে ঝামটপুর গ্রাম। প্রৌঢ় বয়সে ইনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং রঘুনাথ দাসের শিষ্যত্ব এবং সেবকত্ব গ্রহণ করেন। সনাতন এবং রূপ গোস্বামীর নিকট ইনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন। কৃষ্ণদাস ছিলেন যেমন বিদ্বান্ তেমনি রসবেত্তা এবং কবিত্বপ্রতিভাসম্পন্ন। ইঁহার রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য গোবিন্দলীলামৃত অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

পাছে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত তুলনায় হীন প্রতিপন্ন হইয়া অনাদৃত হয় এই আশঙ্কায় কৃষ্ণদাস তাঁহার চৈতন্যচরিত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উপর বরাত দিয়া সারিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের মধ্য জীবনের অনেক কথা এবং শেষ জীবনের কাহিনী যাহা অন্যত্র কোথাও লিখিত হয় নাই তাহা, কৃষ্ণদাস যথাযথভাবে অথচ বিশেষ দক্ষতা ও কবিত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের শেষ কয় বৎসরের জীবনকথা জানিবার তাঁহার যে সুযোগ ছিল তাহা অন্য কাহারও ছিল না। রঘুনাথ দাস শ্রীচৈতন্যের বর্ত্তমান কালে নীলাচলে বাস করিতেন, তিনি স্বচক্ষে অনেক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক লীলা তিনি স্বীয় গুরু, শ্রীচৈতন্যের অভিন্নহৃদয় মর্ম্মসহচর স্বরূপ দামোদরের নিকট অবগত হইয়াছিলেন। এই সকল তথ্য কৃষ্ণদাস রঘুনাথের কাছে পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং তথ্যনিষ্ঠা অতিশয় বলবতী ছিল ; যখনই তিনি শ্রীচৈতন্যের বিষয়ে কোন নূতন কথা বলিয়াছেন, সেইখানেই তিনি প্রমাণ মানিতে

ভুলিয়া যান নাই। বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত চৈতন্য-চরিতামৃতে স্বল্পাক্ষরে অথচ সহজভাবে বর্ণিত থাকায় গ্রন্থটি অধ্যাত্মনিষ্ঠ ও দার্শনিক ব্যক্তিদিগের নিকট পরম সমাদর লাভ করিয়াছে। একাধারে ইতিহাস, দর্শন ও কাব্যের এমন অপরূপ সমন্বয় কোনও দেশের কোনও সাহিত্যে দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ।

চৈতন্যচরিতামৃত ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়। তখন কৃষ্ণদাস সুবৃদ্ধ। কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহা ১৫৩৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল, কিন্তু নানাকারণে এ মত সমর্থনযোগ্য নহে।

জয়ানন্দ তাহার চৈতন্যমঙ্গল কাব্য লিখিয়াছিলেন জন-সাধারণের জন্য, শিক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণবের জন্য নহে। কবিত্ব-শক্তির বালাই তাহার বড় কিছু ছিল না। সুতরাং জয়ানন্দের গ্রন্থ কাব্য হিসাবে বিশেষ ভাল নহে। শ্রীচৈতন্যের জীবনী জয়ানন্দ সাক্ষাৎভাবে জানিতেন না, দুই তিন বা ততোধিক হাত ফেরতা সংবাদের অতিরিক্ত তাঁহার জানা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নামধাম ইত্যাদি দুই চারিটি নূতন কথা থাকিলেও প্রামাণিকতা হিসাবে নিতান্তই মূল্যহীন। লোচনের কাব্যের মত জয়ানন্দের কাব্যও পুরাণের ধাঁচে রচিত, এবং ইহাও পাঁচালীর মত গাওয়া হইত। মন্দারণ এবং মল্লভূম অঞ্চলেই জয়ানন্দের কাব্যের চলন ছিল।

জয়ানন্দের নিবাস ছিল বর্দ্ধমান (মন্দারণ?) সন্নিকটে আমাই-পুরা গ্রামে। ইহার পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র শ্রীচৈতন্যের অন্যতম

প্রধান পারিষদ গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। জয়ানন্দের মাতার নাম রোদনী। জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে, তিনি যখন তিন বৎসরের শিশু তখন শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের গৃহে একবার অল্প সময়ের জন্য অতিথি হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কোন সময়ে লিখিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীচৈতন্যের জীবনীকাব্যের মধ্যে গোবিন্দদাসের কড়চারও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। বইটি ছোট ; তবে ইহাতে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্যভ্রমণ বিষয়ে অনেক নূতন কথা আছে। রচনাভঙ্গি সুন্দর, তবে নিতান্ত আধুনিক। অনেকেই সন্দেহ করেন যে, বইখানি জাল না হইলেও ইহাতে যথেষ্ট ভেজাল আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কোন শ্রীচৈতন্যজীবনীকাব্য লিখিত হয় নাই ; অষ্টাদশ শতাব্দীতে একখানি হইয়াছিল। এটির চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী, রচয়িতা প্রেমদাস। কাব্যটি কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয়ের ভাবানুবাদ।

ষোড়শ শতাব্দীতে অন্ততঃ তিনখানি অদ্বৈত আচার্য্যের জীবনীকাব্য লিখিত হইয়াছিল। শেষের দুই খানিতে শ্রীচৈতন্যের কথা প্রচুর থাকায় এ দুটিকেও স্বচ্ছন্দে শ্রীচৈতন্য-জীবনীর মধ্যে ধরা চলে। শ্রীহট্ট লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদাস নাম গ্রহণ করেন। বাল্যলীলাসূত্র নামে একটি ছোট সংস্কৃত গ্রন্থে ইনি অদ্বৈত আচার্য্যের বাল্যকথা লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্ত্তী জীবনীকারেরা সকলেই এই বই হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ লাউড়ে বিরচিত হয়

১৪৯০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। বইটি ছোট হইলেও অতিশয় সুললিত। শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধেও অনেক প্রয়োজনীয় নূতন কথা ইহাতে আছে। ঈশান নাগর আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের সঙ্গে একবয়সী। বাল্যকাল হইতেই ইনি শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে প্রতিপালিত হন। সেইজন্য ইনি শ্রীচৈতন্যের অনেক লীলা চাক্ষুষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আচার্য্যের দ্বিতীয়া পত্নী সীতা দেবীর আদেশে ইনি বৃদ্ধ বয়সে লাউড়ে প্রত্যাগমন করেন এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হন, আর তাঁহারই আদেশে অদ্বৈত-প্রকাশ কাব্য রচনা করেন।

হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল ঈশান নাগরের গ্রন্থ হইতে অনেক বড়। গ্রন্থকার অদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য অথবা অনুচর ছিলেন। আচার্য্যের জীবনীর অনেক উপাদান তিনি পাইয়াছিলেন আচার্য্যের গ্রাম-সম্পর্কীয় মাতুল, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বিজয় পুরীর নিকট। আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দের আদেশে হরিচরণ অদ্বৈতমঙ্গল রচনা করেন।

অদ্বৈত আচার্য্যের জীবনী-কাব্য আরও একখানি পাওয়া গিয়াছে; এটি হইতেছে নরহরি দাস রচিত অদ্বৈতবিলাস। খুব সম্ভব বইটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই।

অদ্বৈত আচার্য্যের দ্বিতীয়া ভার্য্যা সীতাদেবী একজন মহীয়সী নারী ছিলেন। ইঁহার জীবনী ষোড়শ শতাব্দীর দুইখানি ক্ষুদ্র কাব্যে বর্ণিত হইয়াছিল। বই দুইখানির নাম যথাক্রমে সীতাগুণকদম্ব এবং সীতাচরিত্র। প্রথমখানির রচয়িতা বিষ্ণুদাস আচার্য্য সীতাদেবীর শিষ্য ছিলেন। দ্বিতীয়-

খানি লোকনাথ দাস বিরচিত। এখানিতে যথেষ্ট ভেজাল আছে; খুব সম্ভব এটি ষোড়শ শতাব্দীর অনেক পরেকার রচনা।

রূপ গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব মহান্তের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদির অনুবাদ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই আরম্ভ হয়। তবে পরবর্ত্তী শতাব্দীতেই এই প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ছোট বড় বহু বৈষ্ণবসাধনা-ঘটিত পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। লোচন দাস এইরূপ কতক-গুলি ছোট বই রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ হইতেছে দুর্ল্লভসার। কবিবল্লভের রসকদম্ব একখানি চমৎকার বই। এই বইটিতে অনেক নূতনত্ব আছে। কাব্য হিসাবেও রসকদম্ব উৎকৃষ্ট রচনা। রসকদম্বের রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল ১৫২০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। কবির পিতার নাম রাজবল্লভ, মাতার নাম বৈষ্ণবী। ইহাদের নিবাস ছিল উত্তর বঙ্গে করতোয়া তীরে মহাস্থানের সমীপে আরোড়া গ্রাম। কবির গুরু উদ্ধব দাস গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন।

৯

চণ্ডীমঙ্গল ও অপরাপর শাক্ত কাব্য

চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, ইহা বৃন্দাবনদাসের উক্তি হইতে বুঝা যায়। ইহার পূর্ব্বে এই কাহিনী কাব্যাকারে না হউক, ব্রতকথা রূপেও যে প্রচলিত ছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত

নহে। যাহা হউক, যে সব চণ্ডীমঙ্গল কাব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাদের কোনটিই ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কথা বলিবার পূর্ব্বে চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর কিছু পরিচয় দিই।

মঙ্গলচণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রকাশই চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর মূলকথা। এই কাহিনী সংস্কৃত ভাষায় লেখা কোন পুরাণে নাই, তবে অনুমান হয় যে, বাঙ্গালা দেশে এই দেবী মাহাত্ম্য কাহিনী বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমটি ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী, দ্বিতীয়টি বণিক্ ধনপতির উপাখ্যান। গল্প দুইটি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

কালকেতু সুদরিদ্র ব্যাধের সন্তান, নিজেও ব্যাধবৃত্তি করিয়া কষ্টে-সৃষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পিতামাতার মৃত্যুর পর সংসার বলিতে নিজে এবং স্ত্রী ফুল্লরা। ফুল্লরা যেমন বুদ্ধিমতী তেমনিই গৃহকর্ম্মনিপুণা। স্বামী বনের পশু মারিয়া গৃহে আনে, স্ত্রী মাথায় বহিয়া লোকের ঘরে ঘরে, হাটে বাজারে সেই মাংস বিক্রয় করিয়া আসে। কেহ বা নগদ কড়ি দিয়া কিনে, কেহ বা ধারে। এই দরিদ্র ধার্ম্মিক দম্পতীর উপর দেবীর অনুকম্পা হইল, তিনি স্থির করিলেন ইহাদের দিয়া তিনি পৃথিবীতে আপন মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন। একদিন কালকেতু মৃগয়ায় গিয়া কিছুই পাইল না, অনেক কষ্টে একটি স্বর্ণকান্তি গোধিকা জীবিত অবস্থায় ধরিয়া গৃহে লইয়া আসিল। ফুল্লরাকে ঘরে না দেখিয়া, চালের খুঁটিতে গোসাপটাকে বাঁধিয়া স্ত্রীকে খুঁজিতে বাহির হইল। কালকেতু দরজা পার হইবামাত্র দেবী ষোড়শবর্ষীয়া

সুন্দরী বালিকার রূপ ধরিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া রহিলেন। ফুল্লরা অন্য পথ দিয়া ঘরে আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। বিস্ময় দমন করিয়া বালিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তাঁহার পতি বৃদ্ধ ও উদাসীন, তাহার উপর কলহপ্রিয়া সতিনীর উপদ্রব, সেইজন্য তিনি গৃহত্যাগ করিয়া বনে বনে ফিরিতেছিলেন। এমন সময়ে ব্যাধ কালকেতু তাঁহাকে "নিজ গুণে বাঁধিয়া" (এখানে দুইটি অর্থ—দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, অথবা নিজের গুণে বশীভূত করিয়া) গৃহে লইয়া আসিয়াছে। শুনিয়া ফুল্লরার বিস্ময় ঘুচিয়া হতাশার সঞ্চার হইল। সে দেবীকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, স্বামী যতই দুর্ব্বৃত্ত, গৃহ যতই অশান্তিপূর্ণ হউক না কেন স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গতি; স্বামী পরিত্যাগিনী পত্নীর ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। বালিকা তাহাতেও ভিজিল না দেখিয়া ফুল্লরা অন্য পথ ধরিল। নিজেদের বারমাসিয়া দুঃখের নিখুঁত বর্ণনা করিয়া দেবীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, তাহাদের গৃহে থাকিলে তাঁহার দুর্গতির পরিসীমা থাকিবে না। এত শুনিয়াও দেবী চলিয়া যাইবার ভাব দেখাইলেন না। তখন স্বামীর উপর ফুল্লরার দারুণ অভিমান হইল; সে স্বামীকে খুঁজিয়া আনিতে চলিল। পথে দুজনের দেখা হইল। ফুল্লরার কথায় কালকেতু বিষম ধাঁধায় পড়িয়া গেল; এ বলে কি? সে ত কোন সুন্দরী বালিকাকে গৃহে আনে নাই! গৃহে ফিরিয়া কালকেতুর চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটিল। বিস্ময়ের ঘোর কাটিলে সেও দেবীকে স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিল। এতক্ষণে দেবী স্বামী স্ত্রীর সাধুতার

পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া কালকেতু ও ফুল্লরাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং একটি মূল্যবান অঙ্গুরী উপহার দিয়া সশরীরে অন্তর্হিত হইলেন। অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া কালকেতু বহু ধন পাইল, সেই অর্থে জঙ্গল কাটাইয়া নূতন রাজ্য ও রাজধানীর পত্তন করিল। নানা জাতির লোক আসিয়া কালকেতুর রাজ্যে বসতি করিল। সেই সঙ্গে আসিল ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক ভাঁড়ু দত্ত। রাজার নিকট মিথ্যা পরিচয় দিয়া পসার জাঁকাইয়া ভাঁড়ু প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। কালকেতু সংবাদ পাইয়া ভাঁড়ুকে অপমান করিয়া নিজের রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিল। কালকেতু প্রদত্ত অপমানের প্রতিশোধ লইবার বাসনায় ভাঁড়ু কালকেতুর প্রতিবেশী রাজাকে উত্তেজিত করিয়া কালকেতুর রাজ্য আক্রমণ করাইল। কালকেতু বীরের মত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া একস্থানে লুকাইয়া রহিল। ভাঁড়ু দত্ত ছলনা করিয়া ফুল্লরার নিকট সেই গুপ্ত স্থান জানিয়া লইয়া রাজাকে বলিয়া দিল। কালকেতু বন্দী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। কারাগারে অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিতে করিতে কালকেতু দেবী চণ্ডীকে স্মরণ করিতে লাগিল। দেবী রাজাকে স্বপ্ন দিলেন; কালকেতুকে দেবীর বরপুত্র জানিয়া রাজা অবিলম্বে তাহাকে কারামুক্ত করিল। কালকেতু স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিল। বহুদিন রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগের পর কালকেতু সস্ত্রীক স্বর্গে গমন করিল। ইহাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম উপাখ্যান।

উজানী নগরে এক ধনবান্ বণিক ছিল, নাম ধনপতি। প্রথম পত্নী লহনা নিঃসন্তান বলিয়া ধনপতি রূপসী ও গুণবতী

বালিকা খুল্লনাকে বিবাহ করিল। বিবাহের অল্পকাল পরেই তাহাকে রাজার আদেশে বিদেশে যাইয়া কিছুকাল থাকিতে হইল। এই অবসরে দাসী দুর্ব্বলার কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া লহনা সপত্নী খুল্লনাকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিল। অন্ন-বস্ত্রের কথা দূরে থাক, খুল্লনাকে মাঠে ছাগল চরাইতে যাইতে বাধ্য করা হইল। বনমধ্যে ছাগল চরাইতে চরাইতে খুল্লনা দেখিল যে কতকগুলি স্ত্রীলোকে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতেছে। ইহারা বিদ্যাধরী। খুল্লনাকে চণ্ডীপূজা শিখাইবার জন্যই তাহারা পূজা করিতেছিল। ইহাদের নিকট খুল্লনা চণ্ডীর মাহাত্ম্য অবগত হইয়া চণ্ডীর উপর ভক্তিমতী হইল। ধনপতি দেশে প্রত্যাগত হইলে খুল্লনার দুঃখের রজনী প্রভাত হইল। কিন্তু সুখের দিনও চিরস্থায়ী হইল না; কিছুদিন পরেই ধনপতিকে বাণিজ্যার্থে সিংহল-যাত্রা করিতে হইল। খুল্লনা তখন সন্তানসম্ভবা। অজয় ও গঙ্গা বাহিয়া ধনপতির বাণিজ্য-তরী সমুদ্রে পড়িল। সিংহলের যখন কাছাকাছি আসিয়াছে, তখন ধনপতি সমুদ্রগর্ভে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিল - সুবৃহৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বসিয়া এক ষোড়শী তরুণী একটি হস্তীকে একবার গ্রাস করিতেছে, পরক্ষণে উদ্গীরণ করিয়া ফেলিতেছে! এ অদ্ভুত দৃশ্য কিন্তু ধনপতি ছাড়া আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। সিংহলে পৌঁছিয়া ধনপতি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথারীতি উপঢৌকন দিয়া তাঁহাকে খুসী করিল এবং পণ্য দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় করিতে লাগিল। দুরদৃষ্টক্রমে ধনপতি কথা-প্রসঙ্গে একদিন রাজার নিকট সমুদ্র-বক্ষে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের কথা বলিয়া ফেলিল। এই প্রকার অসম্ভাব্য ব্যাপার শুনিয়া রাজা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিল। ধন-

পতির রোখ চাপিয়া গেল ; সে প্রতিজ্ঞা করিল যে, রাজাকে এই দৃশ্য দেখাইবে, আর না দেখাইতে পারিলে যাবজ্জীবন কারাবাস বরণ করিবে। রাজাকে লইয়া ধনপতি সমুদ্র-বক্ষে সেই স্থানে গেল, কিন্তু সে দৃশ্য দেখাইতে পারিল না। ধনপতি চিরদিনের মত কারাগারে আবদ্ধ হইল। এ সবই দেবীর চক্রান্ত, তিনি ধনপতিকে কষ্ট দিয়া আপন ভক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এদিকে খুল্লনা এক পুত্রসন্তান প্রসব করিল ; পুত্রের নাম হইল শ্রীপতি (বা শ্রীমন্ত)। পিতৃহীন শিশু মাতার যত্নে বাড়িয়া উঠিল এবং উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীপতি নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধান করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িল। তাহার আগ্রহাতিশয্যে মাতা সমুদ্র-যাত্রার সম্মতি না দিয়া থাকিতে পারিল না। শ্রীপতিও পিতার মত বাণিজ্য-তরী লইয়া সিংহল-উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সিংহলের উপকূলের নিকটে শ্রীপতিও সেই অপূর্ব্ব "কমলে কামিনী" দৃশ্য দেখিল। সিংহলে পৌঁছিয়া সে পিতার মতই হঠকারিতা করিয়া রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। এবার কথা রহিল, না দেখাইতে পারিলে শ্রীপতির প্রাণদণ্ড হইবে। বলা বাহুল্য, শ্রীপতিও রাজাকে দৃশ্যটি দেখাইতে পারিল না। শ্রীপতির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। ওদিকে বাড়ীতে বসিয়া খুল্লনা পুত্রের বিপদ আশঙ্কা করিয়া একান্ত মনে দেবীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এইবার দেবী পিতাপুত্রের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। শ্রীপতিকে যখন শূলে চড়াইবার জন্য মশানে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তখন দেবী শ্রীপতির অতিবৃদ্ধ-পিতামহী রূপে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে বালকের প্রাণ-ভিক্ষা চাহিলেন। রাজা

স্বীকৃত হইল না। দেবী তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার ভূতপ্রেত-পিশাচ সৈন্যকে রাজধানী আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন; অল্পকাল মধ্যেই রাজসৈন্য পরাভূত হইয়া গেল। রাজা দৈবীশক্তি জানিতে পারিয়া শ্রীপতিকে ছাড়িয়া দিয়া দেবীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। শ্রীপতি প্রথমেই কারাগারে গিয়া পিতাকে মুক্ত করিল। অন্ধ কাবাব মধ্যে পিতা পুত্রের প্রথম দর্শন হইল। দেবীর আদেশে বাজা তাহার কন্যা সুশীলার সহিত শ্রীপতিব বিবাহ দিল। পুত্র, পুত্রবধূ এবং প্রচুর ধনরত্ন ও পণ্যদ্রব্য লইয়া ধনপতি দেশে প্রত্যাগমন করিল এবং দেবীব অনুগ্রহে পুত্র পবিবাব লইয়া সুখে দিন যাপন করিতে লাগিল। ইহাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেব দ্বিতীয় উপাখ্যান।

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের বচনা-কাল জানা নাই। তবে কাব্যটি বিশেষ প্রাচীন বলিয়াই অনুমান হয়। মাণিক দত্ত সম্ভবতঃ উত্তববঙ্গেব মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন।

সন-তারিখ হিসাবে মাধব আচার্য্যেব চণ্ডীমঙ্গলই প্রাচীনতম। ইহার বচনা কাল হইতেছে ১৫০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ। কবির পিতার নাম ছিল পরাশর; ইহাদের নিবাস ছিল সপ্তগ্রাম। বাঙ্গালা দেশ তখন আকবরের অধীনে আসিয়াছে। মাধব আচার্য্য আকবরকে বিক্রমে অর্জ্জুনের সঙ্গে তুলনা কবিয়াছেন। মাধব আচার্য্যের কাব্য পূর্ব্ববঙ্গেই বিশেষ প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইনিও একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে, মাধব আচার্য্য দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বসতি করেন। মাধব আচার্য্য প্রণীত-

একটি গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক গঙ্গামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। কাব্যটি ক্ষুদ্র। এই মাধব আচার্য্য এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা একই ব্যক্তি কিনা বলিবার কোন উপায় নাই।

চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতাদিগের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন কবিকঙ্কণ-উপাধিক মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদিগেব মধ্যে অন্যতম। মুকুন্দ-বামেব কাব্য প্রচারিত হইবাব পব অন্য কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য আর আসব জমাইতে পারে নাই। মুকুন্দরামের অঙ্কিত সব চরিত্রই যেন জীবন্ত।

মুকুন্দরামের পিতাব নাম হৃদয় মিশ্র; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবি-চন্দ্র এবং কনিষ্ঠ রমানাথ (মতান্তবে রামানন্দ)। ইহাদের বহুপুরুষ হইতে নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব-সীমান্তে দামুন্যা বা দামিন্যা গ্রামে। পাঠান রাজত্বের শেষ এবং মোগল আমলের প্রারম্ভে দেশে প্রবল অবিচার-অত্যাচারের বন্যা প্রবাহিত হইল। অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা এবং নিম্নপদস্থ কর্ম্মচাবীদিগের দৌরাত্ম্যে পৈতৃক ভিটায় বাস কবা মুকুন্দবামেব পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। যখন একেবারে অসহ্য হইল তখন শিশুপুত্র, পত্নী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এবং দুই একজন বিশিষ্ট অনুচর সঙ্গে লইয়া কবি পথে বাহির হইলেন। পথে তিনি প্রবলের অত্যাচার যথেষ্টই অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দরিদ্র গৃহস্থের সহৃদয় সামান্য আতিথ্য তাঁহার মানসিক দুঃখের উপর অমৃতপ্রলেপেব কার্য্য করিয়াছিল। পথে কোন্ দিন যদু কুণ্ডু নামে এক গৃহস্থ তাঁহাকে তিন দিন রাখিয়া ভিক্ষা দিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে রাজ-সভার আড়ম্বরের মধ্যে বসিয়া

কাব্যরচনার কালেও কবি তাহার কথা বিস্মৃত হন নাই। বহু নদ নদী খাল বিল পার হইয়া কবি অবশেষে মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামে পৌছিয়া সেখানকার জমিদার বাঁকুড়া রায়ের দ্বারস্থ হইলেন। বাঁকুড়া রায় মুকুন্দরামের মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পাইয়া সাদরে আশ্রয় দিলেন। মুকুন্দরাম বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। দেশত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করিবার কালে মুকুন্দরাম স্বপ্নে দেবী-কর্ত্তৃক চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, একথা রঘুনাথ শুনিয়াছিলেন। রঘুনাথ রাজা হইয়া মুকুন্দরামকে দেবীর আদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, তদনুসারে মুকুন্দরামের কাব্য রচিত হয়। মুকুন্দরাম সম্ভবতঃ আর দেশে ফিরেন নাই। তাহার পুত্র শিবরাম দেশে বাস করিয়াছিলেন। দামুন্যা গ্রামে মুকুন্দরামের পৈতৃক দেবতা সিংহবাহিনী এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন।

মুকুন্দরাম মানসিংহকে "গৌড়বঙ্গ-উৎকল-অধীপ" বলিয়াছেন। মানসিংহ ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার সুবেদার হন, সুতরাং তাঁহার কাব্য ১৫৯৪ সালের কিছু পরেই রচিত হইয়াছিল।

মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যে দুইখানি বোধ হয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। বংশীবদন বা বংশীদাস চক্রবর্ত্তীর কাব্যের কোন কোন পুঁথিতে নাকি রচনা-কাল দেওয়া আছে— "জলধির মাঝেত ভুবন মাঝে দ্বার।" ইহা হইতে ১৪২৭ শকাব্দ পাওয়া যায়, ১৪৭২ শকাব্দও হইতে পারে। এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে।

বংশীবদনের নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমায় পাতুয়ারী গ্রামে। ইনি দরিদ্র ছিলেন, মনসার পাঁচালী গাহিয়া অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বংশীবদনের পত্নীর নাম সুলোচনা। কবির একমাত্র সন্তান কন্যা চন্দ্রাবতী উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার রচিত ছড়া কিছু কিছু ময়মনসিংহ-অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, মনসামঙ্গল-রচনায় বংশীবদন চন্দ্রাবতীর সাহায্য পাইয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর সহিত জয়চন্দ্র নামক এক ব্রাহ্মণকুমারের বিবাহ স্থির হয়। জয়চন্দ্র কিন্তু এক মুসলমান রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। চন্দ্রাবতী আর বিবাহ করেন নাই। এই কাহিনী ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত এক পল্লীগাথায় বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে রচিত বিস্তর মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। সে সবগুলির মধ্যে বংশীবদনের কাব্যই শ্রেষ্ঠ। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হইয়াও বংশীবদন কোথাও অযথা পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন নাই। অপরদিকে ইহার কাব্য গ্রাম্যতা দোষ হইতে একেবারে মুক্ত।

নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল কাব্য রচনার কাল দেওয়া নাই, তবে কাব্যটি পড়িলে প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। অন্ততঃ পক্ষে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগের রচনা না হইবার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। ইনিও ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমার লোক। ইঁহার নিবাস ছিল বোর গ্রামে। কবির পুরা নাম ছিল রামনারায়ণ দেব, এবং উপাধি ছিল সুকবি বল্লভ। কাব্যহিসাবে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ নিন্দনীয়

নহে। পূর্ব্ববঙ্গে মনসামঙ্গল সাধারণতঃ পদ্মাপুরাণ নামেই উল্লিখিত হইত।

নারায়ণ দেব আরও একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। এই কাব্যটির নাম কালিকাপুরাণ। ইহাতে হর-গৌরীর গৃহস্থালীর কথা এবং গৌরীর পিতৃগৃহে আসিয়া শরৎকালীন পূজা গ্রহণ ইত্যাদি বাঙ্গালাদেশ-প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ শতাব্দী

১০

আদি মোগল শাসন—ঐতিহাসিক উপক্রমণিকা

মোগল সৈন্যের দ্বারা বিজিত হইয়া বাঙ্গালা দেশ ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাটের শাসনাধীনে আসে, কিন্তু পাঠান সুলতানদিগের সেনাপতিরা এবং সামন্ত রাজারা সহজে মোগল শাসন মানিয়া লয় নাই। শেষ পাঠান সুলতান দাউদ খান কররানীর রাজ্যপ্রাপ্তির সময় হইতেই দেশে উপদ্রব অশান্তি সুরু হইয়াছিল। স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা এবং খাজনা আদায়কারী কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরাম স্বীয় আত্মকাহিনীর মধ্যে এইরূপ অত্যাচারের একটি উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন।

মোগল রাজত্বের উপদ্রবহীন সুশাসনের মাঝে আসিয়া লোকে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির জীবনে সর্ব্বাঙ্গীণ জাগরণের উন্মেষ হইয়াছিল। এই সুযোগে বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য আরও স্ফুটতর হইতে লাগিল। বাঙ্গালা সাহিত্য তখন নিজের পথ খুঁজিয়া লইয়া স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রাজার বা রাজ দরবারের সাহায্য তাহার পক্ষে আর আবশ্যক হইল না। মোগল শাসনের

যোগাযোগে বাঙ্গালাদেশ স্বতন্ত্র রাজ্য না থাকিয়া উত্তরাপথের প্রদেশ বিশেষ হইয়া পড়িল। ইহার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার কতিপয় প্রধান পারিষদেব প্রভাবে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সহিত বাঙ্গালাদেশের সংযোগ নিকটতর হইয়াছিল। এখন রাষ্ট্রীয় এবং বাণিজ্যিক সংযোগও স্থাপিত হইল। ইহাব ফল কিন্তু অবিমিশ্রভাবে মঙ্গলজনক হইল না। বাঙ্গালাব যে সংস্কৃতি-গত স্বাতন্ত্র্য ছিল, তাহা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেব প্রভাবে পড়িয়া নষ্ট হইবার পথে বসিল। মোগল দববাবেব ঐশ্বর্য্য এবং আড়ম্বর বাঙ্গালী জমিদার এবং ধনীদিগেব চক্ষু ধাঁধাইয়া দিল এবং তাঁহাদিগকে নিরুদ্বেগ ভোগবিলাসেব পথে নামাইয়া দিয়া ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশেব পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিল।

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাঙ্গালায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আবার এক প্রবল জোয়াব আসিল। ইহার পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও তাঁহাদের শিষ্য এবং প্রশিষ্যদিগের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের যে প্রচাব ও প্রসার হইতেছিল, তাহার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না। বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল কথা বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল; তাহাবা নিজের নিজের ধর্ম্মমত অক্ষুন্ন রাখিয়া বৈষ্ণবীয়ভাবে জীবনযাপন করার মধ্যে কোনই অসঙ্গতি খুঁজিয়া পায় নাই। কিন্তু এই সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নবোত্তম দত্ত এবং শ্যামানন্দ দাসের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার কতকটা উগ্ররূপ ধারণ করিল। এই ত্রয়ীর মধ্যে শ্রীনিবাসই মুখ্য। ইনি স্বীয় আধ্যাত্মিকতা ও পাণ্ডিত্যে বিষ্ণুপুরের রাজাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং তাহারই ফলে অল্পকালের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ, বিশেষ করিয়া সীমান্ত অঞ্চলগুলি বৈষ্ণবধর্ম্মের

বন্যায় আপনহারা হইয়া ভাসিয়া গেল। নরোত্তম মুখ্যভাবে প্রচারক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার অনবদ্য চরিত্র এবং শিষ্যগণের প্রভাব বরেন্দ্রভূমিতে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। রসকীর্ত্তন বা পদাবলী কীর্ত্তনের ঠাট নরোত্তমেরই অক্ষয় কীর্ত্তি। বাঙ্গালাদেশের এই নিজস্ব সঙ্গীতকলা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের তুলনায় শ্যামানন্দের ব্যক্তিত্ব বিশেষ স্পষ্ট না হইলেও ইহাঁর ও ইহাঁর প্রধান শিষ্য রসিকানন্দের প্রযত্নেই মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যার পত্যন্ত অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিস্তার-লাভ করিয়াছিল।

শ্রীনিবাসের নিবাস ছিল বৰ্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটে যাজিগ্রাম। ইনি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ, শান্তিপুর, পুরী ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের অনুচর যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের দর্শনলাভ করেন। তাহার পর বৃন্দাবনে গমন করিয়া গোপাল ভট্টের শিষ্য হন এবং জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত শিক্ষা করিয়া ব্যুৎপন্ন হন। বৃন্দাবনেই নরোত্তম এবং শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার মিলন হয়। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সময় জীব গোস্বামী তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকটি সিন্দুক ভরিয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র গ্রন্থ বাঙ্গালা দেশে প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। পথে, বিষ্ণুপুরের নিকট জঙ্গলে রাজার অনুচর দস্যুরা ধনরত্ন আছে মনে করিয়া সেই সিন্দুকগুলি লুণ্ঠন করে। ইহাতে শ্রীনিবাস মনে দারুণ আঘাত পান, এবং যতদিন পুস্তকগুলি পাওয়া না যায়, ততদিন সেই দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবেন না স্থির করেন। ইতি মধ্যে বিষ্ণুপুরের যুবরাজ বীর হাম্বীরের

সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বীর হাম্বীর তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বৈষ্ণবতায় মুগ্ধ হন এবং সপরিবার এবং সানুচর বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। বীর হাম্বীরের প্রযত্নে পুস্তকগুলির উদ্ধার হইল এবং অনতিকাল মধ্যেই বিষ্ণুপুর রাজ্য ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল পুরাপুরি বৈষ্ণব হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রভাব পশ্চিম-বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রসারিত হইতে লাগিল। শ্রীনিবাসের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গ ছাইয়া ফেলিল। হরিনাম সংকীর্ত্তনে, কীর্ত্তন গানে, মহোৎসবে দেশ মাতিয়া উঠিল। শ্রীনিবাসের দুই বিবাহ, ঈশ্বরী দেবী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবী। ইঁহার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে এক পুত্র এবং দুই তিনটি কন্যা ছাড়া সকলেই শৈশবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নরোত্তম পদ্মাতীরবর্ত্তী খেতরী গ্রামের কায়স্থবংশীয় জমিদার রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের একমাত্র পুত্র ছিলেন। ইঁহার মাতার নাম নারায়ণী। বাল্যকাল হইতেই নরোত্তম ঈশ্বরনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যপ্রবণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর খুল্লতাতপুত্র সন্তোষ দত্তের উপর বিষয়-কর্ম্মের ভার চিরদিনের মত নিক্ষেপ করিয়া নরোত্তম বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। তথায় স্বীয় ভক্তিনিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় লোকনাথ গোস্বামীর চিত্ত জয় করিয়া তাঁহার শিষ্যত্বলাভ করিয়া ধন্য হন। ইনি জীব গোস্বামী এবং বৃন্দাবনের অপরাপর বৈষ্ণব মহান্তদিগেরও স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। এইখানেই শ্রীনিবাস এবং শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরোত্তম দেশে ফিরিয়া আসেন এবং ভজন সাধনায় মন দেন।

ইহাঁর এবং ইহাঁর শিষ্যগণের প্রচেষ্টার ফলে উত্তরবঙ্গ বৈষ্ণব ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া পড়ে। বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার কিছুকাল পরে নরোত্তম নিজগৃহে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ এবং রাধাকৃষ্ণের কয়েকটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে বাঙ্গালা দেশের সকল প্রধান প্রধান বৈষ্ণবই আগমন করেন। তখনও শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ অনুচর কেহ কেহ জীবিত ছিলেন, তাঁহাদেরও পরম সমাদরে আনয়ন করা হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষেই নরোত্তম এবং মার্দ্দঙ্গিক দেবীদাসের চেষ্টায় রসকীর্ত্তন সৃষ্টি হইয়াছিল। নানা দিক দিয়া বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসে এই উৎসব একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

শ্যামানন্দ ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ। ইঁহার নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলার ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে। ইনি বিশেষ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় শ্রীনিবাস এবং নরোত্তম হইতে হীন ছিলেন না। শ্রীচৈতন্যের অন্যতম আদ্য অনুচর কালনার গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দ ইঁহার গুরু ছিলেন। মেদিনীপুর এবং উড়িষ্যার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে শ্যামানন্দ তাঁহার ধনী শিষ্য রসিকানন্দের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

১১

বৈষ্ণব পদাবলী, জীবনী ও বিবিধ কাব্য

যে সময়েব কথা বলিতেছি তখন বৈষ্ণব গীতিকাব্যেরই বিশেষ কবিয়া চর্চ্চা হইতেছিল। এই সময়ের পদকর্ত্তাবা প্রায় সকলেই হয় শ্রীনিবাস আচার্য্য, নয় নবোত্তম, নতুবা শ্রীখণ্ডের নরহবি ও রঘুনন্দনের শিষ্য প্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীনিবাস নিজেও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি বেশী পদ রচনা করেন নাই। নবোত্তম একজন বিশিষ্ট পদাবলী-রচয়িতা ছিলেন। ইনি কয়েকখানি বৈষ্ণবসাধন-বিষয়ক ছোট ছোট গ্রন্থ রচনা কবিয়াছিলেন, তাহাব মধ্যে প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নবোত্তমের প্রার্থনা পদগুলির তুলনা নাই। মনের ব্যাকুলতা ও ভক্তহৃদয়ের গভীর বিশ্বাস এই পদগুলির মধ্যে অপূর্ব্ব ঝঙ্কার তুলিয়াছে। নরোত্তমের শিষ্যদিগের মধ্যে বড় পদকর্ত্তা ছিলেন বসন্ত রায় এবং শিবরাম। শ্রীনিবাসের শিষ্যদিগেব মধ্যে কবি-হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ-দাস চক্রবর্ত্তী, মোহনদাস, রাধাবল্লভদাস এবং যত্নন্দন। গোবিন্দদাস কবিরাজ বৈষ্ণব গীতিকবিদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিলে অন্যায় হয় না। ইনি কেবল ব্রজবুলিতেই পদরচনা করিতেন। ইহার পদগুলি ভাষার ঝঙ্কারে ও অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্যে বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে তুলনীয়। গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যাম পিতামহের মত ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে পদ

রচনা অনেকটা গতানুগতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। রূপ গোস্বামীর গ্রন্থে যে ভাবে কৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই ভাবেই সকলে পদ রচনা করিয়া যাইতেন ; নূতনত্ব বা স্বাতন্ত্র্য দেখাইবার কোনই চেষ্টা ছিল না। সেই জন্য ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পদগুলির তুলনায় এ যুগের পদগুলি কাব্য-সৌন্দর্য্যে সাধারণতঃ নিকৃষ্ট ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রামগোপাল দাস, জগদানন্দ, জয়কৃষ্ণ, মনোহর দাস এবং "হরিবল্লভ" এই ছদ্মনামধারী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মহান্তদিগের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট জীবনী-কাব্য রচিত হইয়াছিল। দুই একখানি ছাড়া সব-গুলিতেই মুখ্যতঃ শ্রীনিবাস আচার্য্যের এবং গৌণতঃ নরোত্তম দত্তের জীবনী ও কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস ১৫২২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। বইটিতে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের সম্বন্ধে অনেক তথ্য বিবৃত আছে। তবে প্রক্ষিপ্ত অংশের পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে। যাহা হউক বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রেমবিলাসের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। নিত্যানন্দ-দাসের প্রকৃত নাম ছিল বলরাম দাস। ইনি নিত্যানন্দের কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য এবং নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের অনুচর ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইনিই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বলরাম দাস। প্রেমবিলাস রচনা করিবার পূর্ব্বে নিত্যানন্দদাস বীরচন্দ্রেরও একখানি জীবনী রচনা করিয়াছিলেন। বইটির নাম ছিল বীরচন্দ্রচরিত। এই

বইয়ের কোন পুঁথি আজও পাওয়া যায় নাই। প্রেমবিলাসের মধ্যে গ্রন্থকার বীরচন্দ্রচরিতের উল্লেখ করিয়াছেন।

গুরুচরণ দাসের প্রেমামৃত বিরচিত হয় শ্রীনিবাস আচার্য্যের কনিষ্ঠা ভার্য্যা গৌরাঙ্গপ্রিয়ার আদেশে। কবি গৌরাঙ্গপ্রিয়ার শিষ্য ছিলেন। বইটিতে শ্রীনিবাসের জন্ম হইতে তাঁহার পুত্র গতিগোবিন্দের জন্ম পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমামৃত প্রেমবিলাসের পরে রচিত হয়, কেননা ইহাতে নিত্যানন্দদাসের গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্যদিগের মধ্যে যদুনন্দন নামধারী দুইজন ছিলেন, একজন ব্রাহ্মণ এবং অপরজন বৈদ্য। বৈদ্য যদুনন্দন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের একজন বড় কবি ছিলেন। ইনি অনেক ভাল ভাল পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং রূপ গোস্বামীর দুইখানি নাটক—বিদগ্ধমাধব এবং দানকেলিকৌমুদী, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত কাব্য এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্য বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কীর্ত্তিকলাপ লইয়া একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন; বইটির নাম কর্ণানন্দ। কাব্যটি গুরু হেমলতা দেবীর অনুরোধে রচিত হইয়া ১৫২৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০৭-০৮ খ্রীষ্টাব্দ সম্পূর্ণ হয়। এই শ্রেণীর আর একখানি বই বৈষ্ণবামৃত সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ যদুনন্দনের রচনা।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দ বীররত্নাবলী নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থে নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। রাজবল্লভ-বিরচিত বংশীবিলাস বা মুরলী-

বিলাস নামক গ্রন্থে কবির প্রপিতামহ শ্রীচৈতন্যের পারিষদ বংশীবদন চট্ট এবং খুল্লতাত ও গুরু রামচন্দ্র গোস্বামীর ক্রিয়া-কলাপ ও ধর্ম্মোপদেশ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীচৈতন্য এবং বীরচন্দ্র সম্বন্ধেও কিছু কিছু নূতন সংবাদ আছে। বৈষ্ণব সাধনার ইতিহাসের পক্ষে বইখানি মূল্যবান্।

গোপীবল্লভ দাসের রসিকমঙ্গলে শ্যামানন্দের প্রধানতম শিষ্য রসিকানন্দ বা রসিক মুরারির জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। বইখানির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট আছে। গ্রন্থকার রসিকানন্দের শিষ্য ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-সহচরদিগের অন্যতম ছিলেন জগদীশ পণ্ডিত। ইহার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে জগদীশচরিত্রবিজয় গ্রন্থে। শিষ্যপরম্পরা হিসাবে গ্রন্থকার জগদীশ পণ্ডিত হইতে পঞ্চমস্থানীয় ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত শ্রীনিবাস আচার্য্য সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ পুস্তক হইতেছে মনোহরদাস-রচিত অনুরাগবল্লী। বইখানি ক্ষুদ্র বটে। বৃন্দাবনে ১৬১৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বইটি সম্পূর্ণ হয়। মনোহর কবির গুরুদত্ত নাম।

সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেকগুলি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে "দুঃখী" শ্যামদাস-বিরচিত গোবিন্দমঙ্গল। কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে। শ্যামদাস দেব-উপাধিক কায়স্থ ছিলেন; ইহার নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলায়। পিতার নাম শ্রীমুখ। সন্দেহ হয়, ইনি এবং কাশীরাম উভয়েই একই বংশের সন্তান ছিলেন। পরশুরাম চক্রবর্ত্তীর কাব্য পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ সমাদৃত

হইয়াছিল। অভিরামের গোবিন্দবিজয়, "দ্বিজ" হরিদাসের মুকুন্দমঙ্গল এবং কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল বিষ্ণুপুর অঞ্চলেই প্রচলিত ছিল। হরিদাস শ্রীনিবাস আচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্ব অবলম্বনে ইনি একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ভবানন্দের হরিবংশ একটি নূতন ধরণের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। উহার সহিত সংস্কৃত হরিবংশ পুরাণের কোনই সম্পর্ক নাই। কবি পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন। কাব্যটি মন্দ নহে, তবে ভাবের দিক দিয়া এখনকার পাঠকদিগের রুচিকর নহে।

রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অবলম্বনে ছোট ছোট বৈষ্ণব রসতত্ত্বের বই অনেকগুলিই রচিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে নন্দকিশোর দাসের রসপুষ্পকলিকা বা রসকলিকা, রামগোপাল দাসের রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী বা রসকল্পবল্লী, এবং রামগোপালের পুত্র পীতাম্বরের রসমঞ্জরী এবং অষ্টরসব্যাখ্যা। রসকল্পবল্লী সম্পূর্ণ হয় ১৫৯৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাতে অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পদসংগ্রহ পুস্তকের মধ্যে এইটি প্রাচীনতম বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

বৈষ্ণবসাধন-ঘটিত অজস্র ছোট ছোট বইয়ের মধ্যে মনোহরদাস বিরচিত দিনমণিচন্দ্রোদয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। মনোহরদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-বাসী ভক্ত রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা বাণীনাথ পট্টনায়কের প্রপৌত্র। ব্রজমোহন দাসের চৈতন্যতত্ত্বপ্রদীপও একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক।

প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদিগের মধ্যে কাশীরাম কৃত্তিবাসের

পরেই সমধিক প্রসিদ্ধ। কাশীরাম ছিলেন জাতিতে কায়স্থ, উপাধি দেব। নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রাবনী বা ইন্দ্রানী পরগণার মধ্যে সিঙ্গি গ্রামে। কাশীরামের দুই ভাই ছিল, জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণদাস বা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, কনিষ্ঠ গদাধর। তিন ভাই-ই সুকবি ছিলেন। ইহাদের পিতা কমলাকান্ত সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে চলিয়া যান। সম্ভবতঃ সেখানে ইহাদের আত্মীয়-স্বজন ছিল। কাশীরামের কথা হইতে জানা যায় যে, ইহাদের গুরু হরিহর মুখুটি মেদিনীপুরের অন্তর্গত হরিহরপুরের বাসিন্দা ছিলেন। কমলাকান্ত যখন দেশত্যাগ করেন তখন কাশীরামের কাব্য খানিকটা রচিত হইয়াছে।

কাশীরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বাল্যকালেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গৃহত্যাগ করেন। ইহার লেখা দুইখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। একখানি শ্রীকৃষ্ণবিলাস শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত বর্ণনামূলক কৃষ্ণলীলা কাব্য। দ্বিতীয়টির নাম ভক্তিভাবপ্রদীপ। এখানি হইতেছে তাঁহার গুরু জয়-গোপাল-রচিত ভক্তিভাবপ্রদীপ নামক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। জয়গোপালের গুরু ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতম পারিষদ সুন্দরানন্দ।

কাশীরামের পাণ্ডববিজয় বা ভারত-পাঁচালী বাঙ্গালায় লেখা মহাভারত কাব্যসকলের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ। রচনাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় অবধি ইহা সমান সমাদর ও মর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর নৈতিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান উৎস কাশীরামের কাব্য।

কাশীরামের ভারত-পাঁচালীর আদিপর্ব্ব সম্পূর্ণ হয় ১৫২৪

শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার দুই বৎসর পরে বিরাট পর্ব্ব সম্পূর্ণ হয়। কেহ কেহ বলেন যে বিরাট পর্ব্ব রচনার পর কাশীরামের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার পুত্র কাব্যটি সমাপ্ত করেন। এই অনুমানের স্বপক্ষে কোন তথ্য বা যুক্তি নাই।

গদাধরের রচিত কাব্যের নাম জগন্নাথমঙ্গল, সংক্ষেপে জগৎমঙ্গল। এই বইতে পুরীর জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যসূচক পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জগন্নাথমঙ্গল সমাপ্ত হয় ১৫৬৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে।

কাশীরাম ছাড়াও দুই চারি জন কবি সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালায় মহাভারত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। "দ্বিজ" হরিদাসের অশ্বমেধপর্ব্বের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ঘনশ্যামদাস, কৃষ্ণানন্দ বসু এবং অনন্ত মিশ্র—ইহারাও শুধু অশ্বমেধপর্ব্বই রচনা করিয়াছিলেন। বিশারদের শুধু বিরাট-পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে। এটি সম্পূর্ণ হয় ১৫৩৩ বা ১৫৩৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১২ বা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে। নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত কাব্য পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ছিল। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের কাব্যের প্রচার কোচবিহার অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে দুই একখানি রামায়ণ কাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অদ্ভুত-আচার্য্যের কাব্য ছাড়া আর কোনটিই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অদ্ভুত-আচার্য্যের বই সমগ্র উত্তরবঙ্গে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। এমন কি, কৃত্তিবাসের প্রচলিত সকল সংস্করণেই অদ্ভুত-আচার্য্যের কাব্যের কোন কোন অংশ ঢুকিয়া গিয়াছে

কবির প্রকৃত নাম ছিল নিত্যানন্দ। ইহার নিবাস ছিল পাবনা জেলায় অমৃতকুণ্ডা গ্রামে।

১৩

বিবিধ শাক্ত কাব্য

পূর্ববঙ্গে এই সময়ে মনসামঙ্গল কাব্যের আবাদ চলিতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু তিন চারিখানি মাত্র মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়, এবং তার মধ্যে একখানি হইতেছে এতজ্জাতীয় সমুদায় কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গে এইটিই এখন পর্যান্ত একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। কাব্যটির রচয়িতা ক্ষমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ কায়স্থবংশীয় ছিলেন। অনেক স্থলে ভণিতায় ইনি নিজেকে কেতকাদাস—অর্থাৎ কেতকা বা মনসার সেবক—বলিয়াছেন। ক্ষমানন্দের নিবাস ছিল দক্ষিণ রাঢ়ে, দামোদরের দক্ষিণ বা পশ্চিম-তীরে কোন গ্রামে। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে বারা খানের মৃত্যুর অল্প কিছু কাল পরে কাব্যটি রচিত হয়।[১] অন্য এক ক্ষমানন্দ রচিত একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র মনসামঙ্গল কাব্য মানভূমের পুরুলিয়া অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়াছে। কাব্য হিসাবে এটিও নিন্দনীয় নহে।[২] বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলের পুঁথি বীরভূম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। এই কাব্যটিতে নানা বিশেষত্ব আছে। এটি ষোড়শ শতাব্দীর রচনা হওয়াও বিচিত্র নয়। কালিদাসের মনসামঙ্গল ১৬১৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইনি বর্দ্ধমান-বীরভূম সীমান্তের অধিবাসী ছিলেন।[৩] দিনাজপুর অঞ্চলের অধিবাসী জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে কিছু কিছু নূতনত্ব আছে।

"দ্বিজ" জনার্দ্দন বিরচিত ব্রতকথা-জাতীয় নিতান্ত ক্ষুদ্র কাব্য মঙ্গলচণ্ডী-পাঁচালী ছাড়া আর কোনও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয় নাই। এই কাব্যটিতেও শুধু ধনপতির উপাখ্যান আছে, কালকেতুর উপাখ্যান নাই। এই সময়ে রচিত দেবীমাহাত্ম্যসূচক সকল কাব্যই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডী অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল। "দ্বিজ" কমললোচনের চণ্ডিকামঙ্গল বা চণ্ডিকা-বিজয়, অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল এবং রূপ-নারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল এই জাতীয় কাব্য। কমল-লোচনের নিবাস ছিল রঙ্গপুর জেলার ঘোড়াঘাট পরগণায়। ভবানীপ্রসাদ এবং রূপনারায়ণ দুইজনেই ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন। গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলও এই-জাতীয় কাব্য। উপরন্তু ইহাতে বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান, মীননাথের কাহিনী এবং বিদ্যাসুন্দরের গল্প দেওয়া আছে। কাহারও কাহারও মতে গোবিন্দদাসের কাব্য ১৫৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

শিবের গৃহস্থালীবিষয়ক অথবা শিবমাহাত্ম্যসূচক ছোট-খাট কাব্যও দুই একখানি পাওয়া গিয়াছে। দ্বিজ রতিদেবের ক্ষুদ্র কাব্য মৃগলুব্ধ ১৫৯৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। কবিচন্দ্রের শিবায়ন বা শিবমঙ্গল বিষ্ণুপুরের রাজা বীরসিংহের রাজ্যকালে—অথাৎ ১৬৫৬-৮২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে—রচিত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের এক কবি উচ্চ কবিত্ব-শক্তি সম্পন্ন না হইলেও কাব্যের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে অসামান্যতা

দেখাইয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণরাম দাস, জাতিতে কায়স্থ, বাসস্থান কলিকাতার উত্তরে বেলঘরিয়ার নিকটে নিমিতা বা নিমতা গ্রাম। ইঁহার পিতার নাম ভগবতী দাস, এবং পুত্রের নাম নীলকণ্ঠ। কৃষ্ণরামের রচিত তিনখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। প্রথম কাব্য কালিকামঙ্গল; ইহাতে দেবীর মাহাত্ম্যপ্রচার ব্যপদেশে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটি সায়িস্তা খানের সুবেদারির সময়ে (১৬৬৯-৭০ বা ১৬৭৯-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে), সম্ভবতঃ প্রথম দফাতেই, রচিত হইয়াছিল। কবির বয়স তখন বিশ বৎসর। দ্বিতীয় রচনা ষষ্ঠীমঙ্গল ব্রতকথা-জাতীয় ক্ষুদ্রকাব্য। ইহা রচিত হয় ১৬০১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে। তৃতীয় কাব্য রায়মঙ্গল একেবারে নূতন জিনিষ। ইহাতে সুন্দরবন অঞ্চলে উপাসিত ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্যকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। আনুষঙ্গিক-ভাবে ঐ অঞ্চলের কুম্ভীর-দেবতা কালুরায়ের এবং পীর বড় খাঁ গাজীর কাহিনীও দেওয়া আছে। দক্ষিণরায়ের পূজা সুন্দর-বন অঞ্চলে অর্থাৎ চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশে ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে, এবং এই প্রদেশে বড় খাঁ গাজীর গান এখনও উৎসব উপলক্ষে গীত হয়। গাজী সাহেবের এবং কালুরায়ের গান ময়মনসিংহ অঞ্চলেও অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

রায়মঙ্গল কাব্য ১৬০৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কিন্তু দক্ষিণরায়ের বিষয়ে এইটি প্রথম কাব্য নহে। কৃষ্ণরাম তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী এক কবি মাধব-আচার্য্যের কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। রায়মঙ্গলের মূল আখ্যায়িকা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

বড়দহের বণিক দেবদত্ত জলপথে সিংহল হইতেও দূরবর্ত্তী তুরঙ্গ সহরে বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর ধনপতি যেমন সমুদ্রবক্ষে "কমলে কামিনী" দৃশ্য দেখিয়াছিল, পথে দেবদত্তও তদনুরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছিল—সাগর-মধ্যে সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি। কথায় কথায় এই দৃশ্যের ব্যাপার দেবদত্ত তুরঙ্গের রাজা সুরথকে জানাইল এবং তাঁহাকেও দেখাইতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু দেবদত্ত রাজাকে প্রতিজ্ঞামত সেই দৃশ্য দেখাইতে পারিল না। ফলে জীবনের মত কারারুদ্ধ হইল। এদিকে বহুদিন কাটিয়া গেল; দেবদত্তের পুত্র পুষ্পদন্ত পিতার কোন বার্ত্তা না পাইয়া নিজেই তুরঙ্গ সহরে যাইতে প্রস্তুত হইল। জাহাজ গড়িবার জন্য রতাই নামক "বাউল্যা" বা কাঠুরিয়াকে বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিতে হুকুম করিল। সেই বনে দক্ষিণরায়ের অধ্যুষিত একটি বড় গাছ ছিল। সে গাছটি কাটাতে দক্ষিণরায়ের এক অনুচর রায়ের নিকট গিয়া অভিযোগ করিল। ক্রুদ্ধ হইয়া রায় বড় বড় ছয় বাঘকে পাঠাইলেন; তাহারা রতাইয়ের ছয় ভাইকে মারিয়া ফেলিল। রতাই ভ্রাতৃশোকে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে দক্ষিণরায় দৈববাণী দিলেন যে, তাঁহার প্রিয় তরু ছেদন করিয়া অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তিনি তাহার ছয় ভাইকে বধ করিয়াছেন; রতাই যদি পুত্রবলি দিয়া দক্ষিণ-রায়কে পূজা করে তবে তাহার ছয় সহোদর পুনর্জীবিত হইবে। রতাই শুনিয়া তদ্দণ্ডেই দক্ষিণরায়কে পূজা করিয়া পুত্রকে বলিদান দিল। তখন দক্ষিণরায় আবির্ভূত হইয়া রতাইয়ের পুত্র ও ছয় ভাইকে বাঁচাইয়া দিলেন।

রতাই কাঠ লইয়া আসিল। হনুমান এবং বিশ্বকর্ম্মা

আসিয়া নৌকা গড়িয়া দিল। পুষ্পদন্ত সাত ডিঙ্গা ভাসাইয়া সমুদ্রযাত্রা করিল। মাতা সুশীলার স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া দক্ষিণরায় পুষ্পদন্তকে সঙ্কটে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পথে পুষ্পদন্ত পীর বড় খাঁ গাজীর মোকাম এবং দক্ষিণরায়ের পূজাস্থান দেখিলেন। এ বিষয়ে পুষ্পদন্ত কিছুই জানেন না বলিয়া জানিতে কৌতূহল প্রকাশ করিলে কর্ণধার পীর ও দক্ষিণবায়ের কাহিনী, তাঁহাদের বিরোধ ও মিলনের ইতিহাস, এইরূপে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ধনপতি নামে পূর্ব্বে এক সদাগব ছিল। সে বাণিজ্যে যাইবাব পথে এই স্থানে নামিয়া দক্ষিণরায়ের পূজা কবিল। পীবের পূজা না কবায় অনেক ফকীর আসিয়া তাহাকে পীরের পূজা করিতে বলিল। বণিক কুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ফকিবদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দিল। তাহাবা গাজীব নিকট গিয়া নালিশ করিল যে দক্ষিণরায় আর তাহার ব্যাঘ্র-অনুচরদিগের প্রতাপে আব কেহ পীরের সমাদব কবিতেছে না ; তাহারা অশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। গাজী ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন, "দক্ষিণরায়কে বাঁধিয়া আন।" গাজীর আদেশে কালানল বাঘ ও ফকীরেরা গিয়া দক্ষিণবায়েব প্রতিমা ও পূজাস্থানের ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণকে মারধর করিয়া তাড়াইয়া দিল। এদিকে বটে বেনে আসিয়া দক্ষিণরায়কে এই কথা জানাইল। দক্ষিণরায় তাঁহার ব্যাঘ্র সৈন্য লইয়া গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। গাজীরও সৈন্য সব বাঘ। রায়ের সেনাপতি বাঘ হীরা, গাজীর সেনাপতি বাঘ দাউদ খান। উভয় দলে যুদ্ধ বাধিল, গাজীর দল হারিয়া পলাইয়া গেল। গাজী তখন স্বয়ং

রায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন ; উভয়ের মধ্যে ঘোর লড়াই চলিল। পরাজিতপ্রায় হইয়া গাজী রুখিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাত হাজার বাঘ মারিয়া অবশেষে রায়ের গলায় কোপ বসাইলেন। দক্ষিণরায়ের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল বটে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধড়ে লাগিয়া যেমন ছিল তেমনই হইল। পুনরায় যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধেব প্রকোপে পৃথিবী বসাতলে যায় দেখিয়া ঈশ্বব অর্দ্ধ-শ্রীকৃষ্ণ অর্দ্ধ-পয়গম্বর বেশে আবির্ভূত হইয়া দুইজনকে ক্ষান্ত কবিলেন এবং উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপন কবিয়া দিলেন। মিটমাটেব সর্ত্ত হইল যে পীরের মোকামে তাঁহাব পূজা নির্ব্বিঘ্নে চলিবে এবং দক্ষিণ-রায়েব মুণ্ডের প্রতিমা দক্ষিণ দেশে পূজিত হইবে, আব কালুরায়ের অধিকাব হইবে হিজলী অঞ্চলে।

এই কাহিনী শুনিয়া পুষ্পদন্ত সে স্থান হইতে নৌকা ছাড়িয়া দিল। সমুদ্রে পড়িয়া রামেশ্বব ছাড়িয়া কিছু দূবে সমুদ্রবক্ষে পিতার মত সেই আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিল।

ইহাব পর পুঁথি খণ্ডিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গল্পেব পরিণতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পুষ্পদন্তও প্রতিজ্ঞায় হারিয়া গিয়া কারাগারে যাইবে অথবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, কিন্তু দক্ষিণরায়ের স্মরণ করায় তিনি আসিয়া পিতাপুত্রকে উদ্ধার করিবেন। তাহাব পব যথারীতি রাজকন্যাকে বিবাহ কবিয়া পিতার সহিত পুষ্পদন্তেব স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটিবে।

১৪

বাঙ্গালী মুসলমান কবি

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ণব পদাবলী রচনার বন্যাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব ভাবধারায় সমগ্র দেশের চিত্তভূমি পরিষিক্ত হইয়া সরস ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাতেই গীতিকাব্য এরূপ প্রাচুর্য্য লইয়া পুষ্পিত ও বিকশিত হইতে পারিয়াছিল। বাঙ্গালার মুসলমানগণ পূর্ব্ব হইতেই মনে প্রাণে বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান কবিরাও যে বাঙ্গালায় ও ব্রজবলিতে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক গীতিকাব্য রচনা করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন—নসীর মামুদ, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ মর্ত্তুজা, আলি রাজা এবং আলাওল।

পাঠান রাজগণের এবং তাঁহাদের পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের অনুকরণে আরাকান রাজসভা সপ্তদশ শতাব্দীতের বাঙ্গালা সাহিত্যের সমাদর ও পৃষ্ঠপোষকতা জাগাইয়া রাখিয়াছিল। আরাকান রাজসভার মারফৎ ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত আরব্য-উপন্যাসজাতীয় গল্প বা লৌকিক কাহিনী বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানী হইয়াছিল। আরাকান রাজ-সভায় সংবর্দ্ধিত সব কবিই মুসলমান ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছেন দৌলৎ কাজী। আরাকান-রাজ শ্রীসুধর্ম্মার (রাজ্যকাল ১৬২২-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) কর্ম্মচারী আশ্‌রফ খানের আদেশে ইনি সতী ময়নামতী বা

লোরচন্দ্রানী কাব্যের পত্তন করেন, কিন্তু শেষ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। বহুকাল পরে ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাওল বাকি অংশ রচনা করিয়া দিয়া কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন।

আরাকানের এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন সৈয়দ আলাওল। ইহার রচিত পদ্মাবতী অতি উপাদেয় কাব্য। কাব্যটি মালিক মুহম্মদ জৈসীর হিন্দী কাব্য পদুমাবৎ অবলম্বনে রচিত। আরাকানের রাজা থদো মিন্তারের (রাজ্যকাল ১৬৪৫-৫২) উজীর মাগন ঠাকুরের অনুরোধে আলাওল পদ্মাবতী রচনা করেন। আলাওল আরও অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—সৈফু-ল্-মুলুক বদিউ-জ্-জমাল, হপ্ত পৈকর, তোহ্ফা, এবং সিকন্দর-নামা। কিন্তু এই কাব্যগুলি পদ্মাবতীর মত অত উৎকৃষ্ট নহে এবং সেরূপ জনপ্রিয়ও হয় নাই। দৌলৎ কাজীর মত আলাওলও অনেকগুলি চমৎকার বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন। আলাওলের রচনাভঙ্গি সুন্দর, আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগের বাহুল্য একেবারেই নাই।

সৈয়দ সুলতান চট্টগ্রামের অন্তর্গত পরাগলপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের নামেই এই গ্রামের নাম। কবিও পরাগলের বংশধর ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়া সৈয়দ সুলতানের লেখা তিনখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে—জ্ঞানপ্রদীপ, নবীবংশ এবং শবে মেয়েরাজ বা ওফাৎ রসুল বা হজরৎ মহম্মদ-চরিত। জ্ঞানপ্রদীপ যোগসাধনার বই। নবীবংশ বিরাট কাব্য। ইহাতে বারজন নবী অর্থাৎ অবতার বা মহাপুরুষের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নবীদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং

শ্রীকৃষ্ণও আছেন। পুরাণের অনুকরণে রচিত এই কাব্যটিতে কবি বিশেষ সূক্ষ্মদর্শিতা সহকারে হিন্দু এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় কাব্যখানি বোধ হয় স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, নবীবংশেরই শেষ ভাগ।

শেখচাঁদের রসুলবিজয় কাব্যও হজরৎ মহম্মদের জীবনী লইয়া বিরচিত। কাব্যটি বিশেষত্বহীন নহে। শাহ্ মহম্মদ সগীরের ইউসুফ-জোলেখাও সুন্দর কাব্য। মহম্মদ খানের মক্‌তু-ল্-হোসেন (হিজিরা ১০৫৬ সাল) কাব্যে কারবালার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। আবদুল নবীর আমীর হামজা উল্লেখযোগ্য কাব্য।

১৫

ধর্ম্মঠাকুরের ছড়া ও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য

ধর্ম্মঠাকুরের পূজা বাঙ্গালাদেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। বাঙ্গালাদেশে যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহা পরে তান্ত্রিক সহজযানে রূপান্তরিত হয়। এই সহজ-যানের সাধকদিগের রচিত গীত বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন নিদর্শন। বৌদ্ধ গানগুলি সম্বন্ধে প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি। তান্ত্রিক সহজযানের সঙ্গে নাথপন্থী শৈব যোগী-দিগের ধর্ম্মমত এবং অনার্য্য ধর্ম্মবিশ্বাসও কিছু কিছু মিশ্রিত হইয়া ধর্ম্মপূজার উদ্ভব হইয়াছিল। ধর্ম্মপূজকদিগের নিজস্ব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী দেশে বরাবরই প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, মাণিক দত্তের

চণ্ডীমঙ্গলে, বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলে এবং অন্যান্য প্রাচীনতব বাঙ্গালা কাব্যে আমরা ধর্ম্মপূজকদিগেব নিজস্ব পৌরাণিক কাহিনীর কিছু কিছু পবিচয় পাই। ধর্ম্মঠাকুবেব পূজা সমাজের নিম্নস্তবের জাতিদিগেব মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেব মধ্যে ধর্ম্মপূজা নিতান্ত গর্হিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাণিক গাঙ্গুলী বলিয়াছেন, "জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান।" এককালে অর্থাৎ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে এবং তাহাবও পূর্ব্বে ধর্ম্মপূজা সমগ্র পশ্চিম ও উত্তব বঙ্গে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইহা কেবল রাঢ় দেশে, বিশেষ করিয়া দামোদবেব দক্ষিণ এবং পশ্চিমতীববর্ত্তী ভূভাগে, সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। এখনকার দিনেব বড় বড় ধর্ম্মঠাকুবের স্থান সবই এই অঞ্চলে। সম্ভবতঃ এই স্থানেই ধর্ম্মপূজাব উৎপত্তি হয়। ধর্ম্মপূজকদিগের পুবাণেব মতে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র নদী, যাহার তীবে ধর্ম্মেব আদিস্থান "হাকন্দ" অবস্থিত, তাহা দামোদরেব প্রাচীন উপনদী বাঁকাব শাখানদী ছিল। এই নদীব শুষ্ক খাত বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশে মেমারীব নিকটবর্ত্তী স্থানে এখনও স্পষ্ট লক্ষিত হয়। যাহা হউক, সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ধর্ম্মঠাকুর শিব অথবা বিষ্ণু অথবা উভয়ের সহিত একীভূত হইতে আবম্ভ করেন, এবং ধীরে ধীবে ধর্ম্মপূজা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেব মধ্যে গুপ্তভাবে আপন স্থান অধিকাব করিয়া লইতে থাকে। ধর্ম্মঠাকুরের কোন প্রতিমা নাই, কূর্ম্মাকৃতি প্রস্তরখণ্ডই ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক। এখন যে সকল স্থানে ধর্ম্মঠাকুর আছেন তাহারা প্রায়ই শিবরূপে পূজিত হইতেছেন; এই সব স্থানে ধর্ম্মের গাজন শিবের গাজনরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইঁহারা যে মূলে শিব ঠাকুর

ছিলেন না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি অনুষ্ঠানে—শিবের গাজনে পাঁঠা বলি হয় না, কিন্তু ধর্ম্মের গাজনে এখনও হয়।

ধর্ম্মপূজাঘটিত যে সকল গ্রন্থ পাওয়া যায় সেগুলি দুই শ্রেণীতে পড়ে। এক শ্রেণীর গ্রন্থে ধর্ম্মপূজার বিধান এবং তদনুযায়ী মন্ত্র ও ছড়া ইত্যাদি আছে; এগুলিকে ধর্ম্মপূজকের কড়চা বা সাধুভাষায় ধর্ম্মপুরাণ অথবা ধর্ম্মপূজাবিধান বলা যাইতে পারে। অপর শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেছে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য; ইহাতে ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। এগুলি ধর্ম্মপূজার সময় অথবা অন্য সময়েও রামায়ণ, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদির মত নিষ্ঠাসহকারে গাওয়া হইত, এবং এখনও স্থানে স্থানে হইয়া থাকে।

সাহিত্য হিসাবে ধর্ম্মপূজাবিধানগুলির বিশেষ কোনই মূল্য নাই। নানাকারণে এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে তথাকথিত শূন্যপুরাণ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তিনটি বিভিন্ন ধর্ম্মপূজাবিধান পুঁথি নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া শূন্যপুরাণ নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে ১৩১৪ সালে প্রকাশিত হয়। বইটির বানান একটু অদ্ভুত রকমের, তাহা হইতে এবং বিষয় বস্তু হইতে অনেকের ধারণা হইয়া গেল যে বইটি খুবই প্রাচীন। কেহ বলিলেন, একাদশ শতাব্দী; কেহ বলিলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দী; অপরে বলিলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর পরে নহে। কিন্তু শূন্যপুরাণ একখানি বই নয়। ইহাতে কতকগুলি মন্ত্র, কতকগুলি ছড়া এবং কতকগুলি কাহিনীর টুকরামাত্র সঙ্কলিত আছে। এগুলি বিভিন্নকালে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—নিরঞ্জনের উষ্মা কবিতাটি সহদেব

চক্রবর্ত্তীর অনিলপুরাণ হইতে গৃহীত। এই কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল। শূন্যপুরাণে কিছু কিছু প্রাচীন অংশ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার কোনটিকেই ভাষার খাতিরে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ফেলা যায় না। নিরঞ্জনের উষ্মা ব্যতীত শিবের চাষ ও সূর্য্যের ছড়া অংশ দুইটিও মূল্যবান। ধর্ম্মপূজাবিধানগুলি ধর্ম্মের আদি পুরোহিত রামাই পণ্ডিতের নামে চলে।

ধর্ম্মমঙ্গলগুলি যথার্থই কাব্য। সকল ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতেই একই উপাখ্যানের সাহায্যে "আদিদেব" ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই উপাখ্যানের মূলে আছে কতকগুলি উপকথা বা গল্প এবং হয়ত অল্পস্বল্প ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস। অনেকে ধর্ম্মমঙ্গলের পাত্রপাত্রী এবং ঘটনাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক বলিয়া অনুমান করেন। এ অনুমানের বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। ধর্ম্মমঙ্গলগুলি সবই দক্ষিণ রাঢ়ের কবির রচনা, এবং সম্ভবতঃ দুইখানি ছাড়া সবগুলিই লেখা হইয়াছিল দামোদরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে, বর্দ্ধমান জেলায় এবং বর্দ্ধমান-হুগলী-বাঁকুড়ার সীমান্ত প্রদেশে। দক্ষিণ রাঢ়ের কবিদিগের একটা বড় বিশেষত্ব আছে; ইহাদের প্রায় সকলেই আত্মবিবরণের সঙ্গে কাব্যরচনার ইতিহাস বা "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ" কিছু না কিছু দিয়াছেন। প্রায় কোন ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতাই ইহার ব্যতিক্রম করেন নাই।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের উপাখ্যান সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

গৌড়েশ্বরের অধীন ময়নার সামন্তরাজ কর্ণসেনের ছয় পুত্র ঢেকুর গড়ের ইছাই ঘোষকে দমন করিতে গিয়া তাহার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে বৃদ্ধ বয়সে কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের

শ্যালিকা রঞ্জাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহে গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী মহামদ বা মাহুত্যার সম্পূর্ণ অমত ছিল। রঞ্জাবতী ছিলেন ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তিমতী উপাসিকা। তিনি পিতৃগৃহে বয়স্কা সহচরী সাফুলা বা সামুলার নিকট ধর্ম্মপূজা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের অনুগ্রহে রঞ্জাবতীর গর্ভে বৃদ্ধ কর্ণসেনের পুত্র জন্মিল—লাউসেন। রঞ্জাবতীর পুত্র হইয়াছে শুনিয়া মহামদের ঈর্ষ্যানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল; তাহার চেষ্টা হইল, কি করিয়া শিশুকে নষ্ট করা যায়। লাউসেন দেবতাদের অনুগ্রহ পাইয়া মহামদের সকল চক্রান্ত বিফল করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিয়া যৌবন লাভ করিল। লেখা-পড়া এবং যুদ্ধ-বিদ্যায় তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। এখন গৌড়ে গিয়া রাজার নিকট নিজের বাহুবল কৌশল প্রদর্শন করিয়া উপযুক্ত সম্মান ও পুরস্কার লাভ করিতে তাঁহার বাসনা হইল। পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী লাউসেনকে গৌড়ে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। পোষ্য-ভ্রাতা কর্পূরধবলকে সঙ্গে লইয়া লাউসেন গৌড়ের উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে প্রথমেই পড়িল জালন্দার গড়। এখানে কামদল বা কামদ (অর্থাৎ "কেঁদো") বাঘ স্থানীয় রাজা-প্রজাকে হত্যা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছিল। লাউসেন তাহাকে দমন করিলেন। তাহার পর তারাদীঘিতে কুম্ভীরকে পরাজিত করিয়া জামতিতে এক অসতী নারীর কোপে এবং গোলাহাটে এক গণিকার হস্তে পড়িয়া ধর্ম্মের কৃপায় হনুমানের সহায়তায় নিস্তারলাভ করিলেন। তাহার পর লাউসেন গৌড়ে পৌঁছিলেন। মহামদের চক্রান্ত সত্ত্বেও তিনি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিজের বাহুবল দেখাইয়া

রাজার নিকট উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিলেন। দেশে প্রত্যাগমনের পথে কালু ডোমের ও তাহার স্ত্রী লখ্যার সৌহার্দ্দ্য ও আনুগত্য লাভ করিলেন। কালু ডোম সপরিবারে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসিয়া ময়না রাজ্যে বাস করিল।

এদিকে মহামদের একমাত্র চিন্তা হইয়াছে, কি করিয়া লাউসেনকে বিনষ্ট করা যায়। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে রাজাকে বলিয়া লাউসেনকে পাঠাইল কামরূপরাজকে দমন করিতে। লাউসেন কামরূপে গিয়া সেখানকার রাজাকে পরাজিত করিলেন এবং তাঁহার কন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। পথে তাহার আর দুইটি ভার্য্যা লাভ হইল—মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলা এবং বর্দ্ধমানের রাজকন্যা বিমলা।

পুনরায় লাউসেনকে দ্বিতীয় এক অভিযানে প্রেরণ করা হইল। সিমুলের রাজা হরিপালের কানড়া নাম্নী অশেষ রূপগুণসম্পন্না এক দুহিতা ছিল। বহুকাল হইতেই কানড়াকে বিবাহ করিতে গৌড়েশ্বরের বাসনা ছিল। কিন্তু এক কারণে এই বাসনা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। কানড়া ছিল দেবীর অনুগৃহীতা; যাহাতে যে-সে লোক তাঁহাকে বিবাহ করিতে না পাবে এইজন্য দেবী একটি লৌহনির্ম্মিত গণ্ডার দিয়া বলিয়াছিলেন, যে খড়্গাঘাতে গণ্ডারের মাথা কাটিয়া ফেলিতে পারিবে সেই কানড়ার পাণিগ্রহণ করিবে। রাজা বা মহামদের সাধ্য ছিল না যে এ কার্য্য করে। দেবীর অনুগ্রহে লাউসেন লৌহ-গণ্ডারের শিরশ্ছেদ করিয়া কানড়াকে বিবাহ করিলেন এবং নববিবাহিত স্ত্রী এবং তাঁহার পরিচারিকা

ধুমসীকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল পরে লাউসেনের পুত্র-সন্তান জন্মিল। তাহার নাম হইল চিত্রসেন।

তাহার পর লাউসেনের তৃতীয় অভিযান। অজয়তীরবর্ত্তী ঢেকুর গড়ের সামন্ত ইছাই ঘোষ দেবীর বরলাভ করিয়া বিশেষ স্পর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। গৌড়েশ্বরের অধীনতা অস্বীকাব করায় পূর্ব্বে কর্ণসেনের ছয় পুত্র তাহাকে দমন করিতে প্রেরিত হয় এবং তাহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়। এখন লাউসেনকে ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। অজয় নদের তীরে দুই বীরে ভীষণ যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষেই একাধিকবার জয়পরাজয়ের পর শেষে বিষ্ণুব কৃপায় লাউসেনই বিজয়ী হইলেন; ইছাইয়ের পিতা সোম ঘোষ গৌড়েশ্বরেব বশ্যতা স্বীকাব কবিল।

পুনবায় লাউসেনেব ডাক পড়িল। গৌড়ে ভীষণ বৃষ্টি ও জলপ্লাবন উপস্থিত, লাউসেনকে এই দৈবদুর্যোগ কাটাইয়া দিতে হইবে। ধর্ম্মের কৃপায় লাউসেন বৃষ্টি ও জলপ্লাবন প্রশমিত করিলেন।

ইহাতেও লাউসেনেব নিস্তার নাই। এইবাব তাঁহাকে যে সঙ্কটে ফেলা হইল তাহা যেমন উৎকট তেমনি অসম্ভব। লাউসেনকে বলা হইল, পশ্চিমদিকে সূর্য্যোদয় দেখাইতে হইবে নতুবা তাহাব পিতামাতাকে হত্যা করা হইবে। কি কবেন, পিতামাতাকে গৌড়েশ্বরের হস্তে বন্ধক হিসাবে সমর্পণ করিয়া লাউসেন মাতার পুরাতন সহচরী ধর্ম্মের উপাসিকা সাফুলা বা সামুলাকে লইয়া ধর্ম্মের পীঠস্থান হাকন্দে গমন করিলেন। সেখানে তীব্র তপশ্চর্য্যা করিয়া অবশেষে

তিনি ধর্ম্মকে সন্তুষ্ট করিলেন। ধর্ম্মঠাকুর তাঁহাকে পশ্চিম-দিকে সূর্য্যোদয় দেখাইলেন। এই অসম্ভব অতিপ্রাকৃত দৃশ্যের সাক্ষী রহিল হরিহর বাইতি।

ইতিমধ্যে লাউসেনের অনুপস্থিতির সুযোগে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করিয়াছে। লাউসেনের প্রাসাদরক্ষী-দিগের নেতা কালু ডোম উৎকোচে বশীভূত হইয়াছিল কিন্তু স্ত্রীর কথায় প্রবুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিল এবং সপুত্র নিহত হইল। তখন কালুর স্ত্রী অন্তঃপুর রক্ষা করিবার জন্য একাই যুদ্ধ করিতে লাগিল, কিন্তু অচিরে নিহত হইল। কলিঙ্গাও যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সব যায় যায় হইল, এমন সময় কানড়া এবং তাঁহার সহচরী ধুমসী অস্ত্রধারণ করিলেন। মহামদ পরাজিত হইয়া বেত্রাহত কুক্কুরের মত পলাইল।

লাউসেন গৌড়ে ফিরিলেন। মহামদ হরিহর বাইতিকে অশেষ প্রলোভন দেখাইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্ররোচিত করিতে লাগিল। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ হরিহর সাক্ষ্য দিলেন যে তিনি পশ্চিমে সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। লাউসেনের জয়জয়কার হইল। ক্রোধে ক্ষোভে মহামদ হরিহরের নামে মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া তাহাকে শূলে চড়াইল; হরিহর নির্ভীকচিত্তে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন।

পিতামাতা সহকারে লাউসেন দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, কালু, লখ্যা এবং অন্যান্য সকলে যুদ্ধে মরিয়া গিয়াছে। তিনি ধর্ম্মের স্তব করিতে লাগিলেন; ধর্ম্মের অনুগ্রহে যাহারা তাঁহার প্রাসাদ-রক্ষায় প্রাণ দিয়াছিল তাহারা সকলে বাঁচিয়া উঠিল। লাউসেন নিরুদ্বেগে ময়নায়

রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যথাকালে পুত্র চিত্রসেনের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন।

প্রধানতঃ উপকথার সমষ্টি হইলেও এবং কৃষ্ণলীলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকিলেও ধর্ম্মমঙ্গল-আখ্যায়িকার মধ্যে মহাকাব্যোচিত ঐক্য আছে। কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলিও বেশ সুপরিস্ফুট। খেলারাম ধর্ম্মমঙ্গলকে "গৌড়কাব্য" বলিয়াছেন; আমরা বলি, ইহা রাঢ়ের জাতীয় কাব্য।

যতদূর জানা যায়, খেলারামের কাব্য ধর্ম্মমঙ্গলগুলির মধ্যে সুপ্রাচীন। কাব্যটি পাওয়া যায় নাই। ইহার রচনা-কাল সম্বন্ধেও স্থিরতা নাই। সকল ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যেই ময়ূর-ভট্টকে এই বিষয়ের আদি কবি বলা হইয়াছে। ময়ূরভট্টের কাব্য পাওয়া যায় নাই, সুতরাং কবির ও তাঁহার কাব্যের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার উপায় নাই।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে দুইখানি নিশ্চিতভাবে এবং একখানি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল। বাকিগুলি সমস্তই পরবর্ত্তী শতাব্দীতে রচিত হয়। সীতারাম দাসের কাব্য (মল্লাব্দ ১০০৪ সাল) এবং শ্যাম পণ্ডিতের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল। শ্যাম পণ্ডিত বীরভূমের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল কবে যে রচিত হইয়াছিল তাহা সমস্যার বিষয়। পুঁথিতে কাব্যের যে রচনাকাল পাওয়া যায় তাহা একটি মস্ত হেঁয়ালী। তবে কাব্যটি যে ঘনরামের কাব্যরচনার (১৭১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ) পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সন্দেহের অবকাশ নাই।

আত্মপরিচয় এবং কাব্যরচনার ইতিহাস রূপরাম যাহা দিয়াছেন তাহা যেমন সরল তেমনি হৃদয়গ্রাহী। বিবরণটি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করা গেল না।

বহুকাল হইতে রূপরামের পূর্ব্বপুরুষ বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বদক্ষিণ সীমান্তে কাইতি গ্রামের সন্নিকটে শ্রীরামপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন পরম পণ্ডিত; তাঁহার টোলে "বিশাশয়" অর্থাৎ একশত বিশ পড়ুয়া পড়িত। পিতার মৃত্যুর পর কবিরা চারি ভাই বড় কষ্টে পড়িলেন। বড় দাদা রত্নেশ্বর বড় নিষ্ঠুরভাষী ছিল, তাহার "খাইতে শুইতে বাক্যবাণ জ্বলন্ত আগুন।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কটু কথায় রূপরামের ধিক্কার জন্মিল; তিনি দেশান্তরে পড়িতে যাইবেন স্থির করিয়া একদিন "খুঙ্গি পুঁথি" বাঁধিয়া লইলেন। রূপরামের সঙ্কল্প জানিয়া গ্রামস্থ মণিরাম রায় পরিবার জন্য ধুতি একখানি এবং পাথেয় স্বরূপ দুই আনা কড়ি দিলেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম পাসণ্ডায় কবিচন্দ্রের পুত্র রঘুরাম ভট্টাচার্য্যের নিকট তিনি পড়িতে গেলেন। পিতৃহীন নিরাশ্রয় বালককে দেখিয়া ভট্টাচার্য্যের মায়া হইল, তিনি "বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে।" অল্প দিনেই রূপরাম জুমরনন্দীর টীকা সমেত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ, অমরকোষ, বেদ (!), কালিদাসের রঘুবংশ, শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, মাঘের শিশুপালবধ, এবং মহাভারত পাঠ সাঙ্গ করিলেন। একদিন কারক-ব্যাখ্যায় গুরুশিষ্যে বিষম বিতর্ক উপস্থিত হইল। রূপরাম "তিনবার পূর্ব্বপক্ষ করিল সঞ্চার," তাহাতে "সহিতে নারিল গুরু পাবক আকার।" ক্রুদ্ধ ভট্টাচার্য্য রূপরামকে

"ঐমনি পুঁথির বাড়ি বসাইল গায়।"

এবং বলিলেন,

"পড়াতে নারিল বেটা এখনি বিদায়॥
বিগ্তানিধি ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে আছে।
ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে॥
নহে জউগ্রাম চল কনাতের ঠাঞি।
তার সম ভট্টাচার্য্য শান্তিপুরে নাঞি॥"

রূপরাম বলিতেছেন, "সূর্য্যের সমান গুরু পরম সুন্দর," তাহার উপর মুখে বসন্তের দাগ—"চিটঙ্গ মুখের শোভা বসন্তের চিনা," সেই মুখে "বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা।" রূপরামের ভয় হইল, দুঃখও হইল। তিনি খুঙ্গি পুঁথি বাঁধিয়া নবদ্বীপে পড়িতে যাইবেন উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ "হেনকালে জননী পড়িয়া গেল মনে," সুতরাং তিনি "পুনর্ব্বার ফির‍্যা আইলা শ্রীরামপুরের গনে।" আড়ুয়া গ্রাম পশ্চাতে করিয়া তিনি ডাহিন দিকে ফিরিলেন। পুরাতন জাঙ্গালে ঢুকিয়া তিনি পথ হারাইলেন এবং দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া পলাশনের বিলের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার নজর হইল, আকাশে দুইটা শঙ্খ চিল উড়িতেছে, এবং ভূমিতে কিছু দূরে সামনে দুইটা বাঘ বসিয়া লেজ নাড়িতেছে। দেখিয়াই তিনি ভয়ে দৌড় দিলেন, গোপালদীঘির পাড়ে "গোটা তিন কাছাড়" খাইলেন, তাঁহার পুঁথিপত্র চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। পুঁথিপত্র কুড়াইয়া দেখেন সুবন্তটীকার পুঁথিটি নাই, এমন সময় ধর্ম্মঠাকুর ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া—"সুবর্ণ পইতা গলে পতঙ্গ-সুন্দর, কলধৌত-কাঞ্চনকুণ্ডল ঝলমল" বেশে আসিয়া আপনি সুবন্তটীকার পুঁথি কুড়াইয়া রূপরামকে দিলেন, এবং নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে

ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিতে আদেশ করিলেন। ধর্ম্মঠাকুর অন্তর্হিত হইলে রূপরাম অধিকতর ভয়ে দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। বেলা তখন অনেক হইয়াছে; নিজের গ্রামের প্রান্তে আসিয়া তৃষ্ণায় বিকল রূপরাম "শাঁখারী পুকুরে খাইল পরিপূর্ণ জল।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভয়ে ঘরে আসিবার জো নাই। সুতরাং বেলা কাটাইয়া সন্ধ্যা হইলে রূপরাম চুপিচুপি গৃহে উপস্থিত হইয়া "প্রণাম করিল গিয়া মায়ের চরণ।" সে সময় "সোনা রূপা দুটি বোন দুয়ারে বসিয়া;" তাঁহাকে দেখিয়া তাহারা আনন্দে চেঁচাইয়া উঠিল—"রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি পুঁথি লইয়া!" যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়! এমন সময় রত্নেশ্বর আসিয়া পড়িল। রূপরামের "দাদাকে দেখিয়া বড় গায়ে আইল জ্বর;" "তরাসে কাঁপিল তনু তালপাত পারা, পালাবার পথ নাঞি বুদ্ধি হইল হারা।" কঠিনহৃদয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত বালক রূপরামকে প্রচণ্ড তিরস্কার করিয়া বলিল, "কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি আইলা ঘরে!" ভাইয়ের হাত হইতে খুঙ্গি পুঁথি কাড়িয়া লইয়া রত্নেশ্বর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। রূপরাম মনে নিদারুণ তাপ পাইয়া পুঁথি পত্র কুড়াইয়া লইলেন এবং তখনি মায়ের চরণে বিদায় লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। পরদিন শানিঘাট গ্রামে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি এক গৃহস্থের বাড়ী গেলেন,—"ঠাকুরদাস পাল তারা বড় ভাগ্যবান, না বলিতে ভিক্ষা দেন আড়াই সের ধান।" আড়াই সের ধান দিয়া চিঁড়া ভাজা কিনিয়া লইয়া রূপরাম দামোদরে গিয়া স্নান পূজা সারিলেন, তাহার পর জল খাইতে বসিলেন। কিন্তু এখনও

দুর্দ্দৈব সঙ্গ ছাড়ে নাই,—"হেন বেলা চিঁড়া ভাজা উড়াইল বাতাসে।" প্রায় দুইদিন উপবাস, কি করেন? কবি বলিতেছেন, "চিঁড়া ভাজা উড়্যা গেল শুধু খাই জল, খুঙ্গি পুঁথি বয়্যা যাত্যে অঙ্গে নাঞি বল।" অনেক কষ্টে তিনি দীঘলনগর গ্রামে গেলেন। শুনিলেন যে, সেখানে তাঁতীরা বেশ ধার্ম্মিক গৃহস্থ, সুতরাং ভিক্ষা সহজেই মিলিবে। অমনি তাঁতীঘরে চলিলেন; সেখানে "চিঁড়া দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন।" ইহার সঙ্গে খই হইলে ফলারেব আরও জুত হইত, কিন্তু "তাঁতীঘরে ধর্ম্ম ঠাকুর নাঞি দিল খই।" অগত্যা খই ব্যতিরেকেই কবি উদর ভরিয়া ভোজন করিলেন; গৃহস্থ "দক্ষিণা আনিয়া দিল দশ গণ্ডা কড়ি, দৈবের ঘটনে তার কানা দেড় বুড়ি!" অতঃপর সেখান হইতে কবি রওনা হইলেন, এবং পথে পাঁচ দিন উপবাসের পর তিনি এড়ান-বাহাদুরপুর গ্রামে পৌছিলেন। সে স্থান গোপভূমের অন্তর্গত। সেখানের রাজা গণেশ; রূপরাম তাঁহার আশ্রয় পাইলেন। ধর্ম্মঠাকুরের দ্বারা স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া রাজা গণেশ কবিকে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিতে আদেশ করিলেন। কবিও কাব্য রচনা করিয়া ধর্ম্মের আসরে তাহা গাহিয়া অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

রূপরাম দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন নিশ্চয়ই, কারণ তাঁহার বংশধরগণ এখনও শ্রীরামপুরে বাস করিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতাব্দী

১৬

নবাবী আমল—ভূমিকা

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতেই বাঙ্গালার সুবেদার বা নবাবগণের উপর দিল্লীর দরবারের শাসন শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে। দিল্লীতে খাজানা পাঠাইয়া দিলেই একরকম সম্পর্ক চুকিয়া যাইত। কাগজে কলমে না হউক কার্য্যত। বাঙ্গালার সুবেদার ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে স্বাধীন নবাব হইলেন। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চ্চা পূর্ব্বকার শতাব্দীর অনুযায়ীই চলিতে থাকিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসারও বাড়িয়া চলিল। সাহিত্যে নূতনত্বের মধ্যে প্রথমে সত্যনারায়ণের পাঁচালী এবং পরে তর্জ্জা ও কবিগানের সৃষ্টি হইল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-দ্-দৌলার পরাজয় ঘটিলে এই যুগের অবসান সূচিত হইল। এবং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যুগের সাড়া পড়িয়া গেল। সে স্বতন্ত্র কাহিনী।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্য রচনার সূত্রপাত হয়। দক্ষিণ বঙ্গে পোর্ত্তুগীজ মিশনারী পাদ্রীরা তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রচারের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টানী ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব কড়চা গ্রন্থের মত প্রশ্নোত্তরময় ছোট ছোট পুস্তিকাও রচনা করিতে

লাগিলেন। এই কার্য্য পোর্ত্তুগীজ পাদ্রীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত করিতে থাকেন। তাহার পর ইংরেজের অভ্যুদয় ঘটিলে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড দেশের পাদ্রীরা সেই কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বচিত একখানি মাত্র খ্রীষ্টানী বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ এপর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। বইটির লেখক ছিলেন একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান মিশনারী, নাম দোম্ আন্তোনিও। ইনি ছিলেন ভূষণার রাজপুত্র। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দেব কাছাকাছি সময়ে মগ জলদস্যুরা দেশ লুঠ করিতে আসিয়া ইঁহাকে হরণ করিয়া আরাকানে লইয়া যায়। সেখানে জনৈক পোর্ত্তুগীজ পাদ্রী টাকা দিয়া ইহাকে দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করেন এবং উপযুক্ত শিক্ষা দান কবিয়া ইহাকে বোমান ক্যাথলিক মতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। দোম্ আন্তোনিও বিরচিত পুস্তকেব নাম ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক-সংবাদ। ইহাতে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং এক খ্রীষ্টান পাদ্রীর মধ্যে বিচার বিতর্কের ব্যপদেশে খ্রীষ্টানধর্ম্মের সারবত্তা ও হিন্দুধর্ম্মেব অসারতা প্রতিপন্ন করিবাব চেষ্টা করা হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বচিত হয় পোর্ত্তুগীজ ভাষায় মানোএল্ দা আস্সুম্প্সাওঁ নামক পোর্ত্তুগীজ পাদ্রীর দ্বারায়। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণখানি রচিত হয়, এবং ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ত্তুগালের বাজধানী লিস্‌বন হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ব্যাকরণের সঙ্গে আস্সুম্প্সাওঁ বাঙ্গালা-পোর্ত্তুগীজ এবং পোর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা শব্দকোষও ছাপাইয়াছিলেন। ইনি একটি খ্রীষ্টানী গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বইটির নাম "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"

(Crepar Xaxtrer Orthbhed)। রোমান হরফে মুদ্রিত হইয়া এই গ্রন্থটি লিস্‌বন হইতে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের মূলধারা-গুলি অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত ছিল,— সেই বৈষ্ণবপদাবলী,জীবনী-কাব্য, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, রামায়ণ মহাভারত, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল এবং সংস্কৃতে রচিত পুরাণজাতীয় এবং অপরাপর বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ। এই সময়ে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আদর খুবই বাড়িয়া যায়। সত্যনারায়ণের পাঁচালী অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমেই উদ্ভূত হয়, এবং রাঢ় অঞ্চলে বিশেষ সমাদর লাভ করে। ধর্ম্ম এবং প্রণয়সঙ্গীতও লোকপ্রিয় হইয়া ওঠে। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিগান ও তর্জ্জার উদ্ভব হয়, এবং শেষ ভাগে ইহা পরিণতি লাভ করে।

এই সময়ে কয়েকজন মুসলমান কবিরও সন্ধান পাইতেছি। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন উত্তরবঙ্গ-নিবাসী হায়াৎ মামুদ। ইহার চিত্ত-উত্থান কাব্য রচিত হয় ১১৩৯ সালে অর্থাৎ ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। এটি হিতোপদেশের ফারসী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। হায়াৎ মামুদের অন্যান্য গ্রন্থ হইতেছে— মহরমপর্ব্ব (১১৩০ সাল), হেতুজ্ঞান (১১৬০ সাল) এবং আম্বিয়াবাণী (১১৬৪ সাল)।

১৭

পদাবলী, পদসংগ্রহ গ্রন্থ, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও বিবিধ বৈষ্ণব কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অসংখ্য কবি বৈষ্ণব পদ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু দুই চারি জন ছাড়া তাঁহাদের কাহারও কবিত্বশক্তির বালাই বড় ছিল না। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা বলিতে চন্দ্রশেখর এবং তাঁহার ভ্রাতা শশিশেখর, দুইজন রাধামোহন ঠাকুর, নরহরি (ওরফে ঘনশ্যাম) চক্রবর্ত্তী এবং দীনবন্ধু দাস। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের গীতি কবিতায় অসাধারণ পদমাধুর্য্য লক্ষিত হয়।

পদসংগ্রহ গ্রন্থগুলি এই যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যিকদিগের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। এইজাতীয় গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত ও সাধক বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন ; ইহার অনতিকাল পূর্ব্বেই গ্রন্থটি সঙ্কলিত হয়। "হরিবল্লভ" ভণিতায় বিশ্বনাথ অনেক ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলিও ইহার মধ্যে সঙ্কলিত আছে।

তাহার পর নরহরি চক্রবর্ত্তীর গীতচন্দ্রোদয়। এটি বড় গ্রন্থ ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহার অতি অল্প অংশই পাওয়া গিয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর, মহারাজা নন্দকুমারের গুরু, অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা ও পণ্ডিত রাধামোহন ঠাকুর একটি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সে বইটির নাম পদামৃতসমুদ্র। রাধামোহন ইহার একটি সংস্কৃত টীকাও রচনা করিয়াছিলেন। অন্যান্য পদসংগ্রহ-

গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে গৌরসুন্দর দাসের কীর্ত্তনানন্দ, দীনবন্ধু দাসের সংকীর্ত্তনামৃত এবং রাধামুকুন্দ দাসের মুকুন্দানন্দ। কমলাকান্তের পদরত্নাকর এবং নিমানন্দ দাসের পদরসসার উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ সকলেরই উপরে হইতেছে গোকুলানন্দ সেন—ওরফে "বৈষ্ণবদাস"—সঙ্কলিত গীতকল্পতরু বা পদকল্পতরু। পদকল্পতরু বৈষ্ণবপদাবলীর ঋগ্বেদ-সংহিতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে প্রায় দেড়শত কবি রচিত তিন হাজারেরও অধিক পদ বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত রস-পর্য্যায়ে সজ্জিত হইয়া সংগৃহীত হইয়াছে। গোকুলানন্দের গুরু ছিলেন দ্বিতীয় রাধামোহন ঠাকুর। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর, পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলয়িতা নহেন; ইনি ছিলেন "দ্বিজ" হরিদাসের বংশধর। ইনিও একজন ভাল পদকর্ত্তা ছিলেন। কাটোয়ার কাছে টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামে গোকুলানন্দের নিবাস ছিল। পদসংগ্রহ কার্য্যে ইনি স্বগ্রামবাসী কৃষ্ণকান্ত মজুমদার—ওরফে "উদ্ধবদাস"—মহাশয়ের সাহায্য পাইয়াছিলেন। "বৈষ্ণবদাস" ও "উদ্ধবদাস" ভণিতায় দুই বন্ধুর রচিত অনেক-গুলি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

যতগুলি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এই শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কাব্যই সর্ব্বাধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল। কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল মল্লভূমে পান্নুয়া গ্রামে। কাব্যটি সম্ভবতঃ মল্লাবনীনাথ দুর্জ্জনসিংহের রাজ্যকালে (১৬৮২-১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ) রচিত হইয়াছিল। ইহার অপর তিন কাব্য শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, রামায়ণ এবং

মহাভারত যথাক্রমে বীরসিংহ (১৬৫৬-৮২ খ্রীষ্টাব্দ), রঘুনাথ সিংহ (১৭০২-১২ খ্রীষ্টাব্দ), এবং গোপাল সিংহ (১৭১২-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) এই তিন মল্লরাজের রাজ্যকালে লিখিত হইয়াছিল। কবিচন্দ্র বিরচিত ধর্ম্মমঙ্গল এবং মনসামঙ্গলও পাওয়া গিয়াছে। এইসব কাব্যগুলি এক কবির রচনা না হওয়াই সম্ভব। গোপাল সিংহের ভণিতায় পুরাণের ছাঁদে রচিত একটি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে; এটি রাজার কোন সভাসদের রচনা হইবে। বলরামদাসের কৃষ্ণলীলামৃতও পুরাণের ধরণে রচিত; ইহার রচনাকালে ১৬২৪ শকাব্দ ১১০৮ সাল অর্থাৎ ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া কাব্যটি মূল্যবান্।

বৈষ্ণব গ্রন্থের অনুবাদকারিগণের মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য কৃষ্ণদাসই প্রধান। ইনি স্বীয় গুরুর অনেকগুলি গ্রন্থ বাঙ্গালা কাব্যে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দ কাব্যের অন্ততঃ চারিখানি অনুবাদ এই সময়ে করা হইয়াছিল। বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী চাণক গ্রামনিবাসী শচীনন্দন বিদ্যানিধি ১৭০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল-নীলমণির একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। বইটির নাম উজ্জ্বলচন্দ্রিকা। এই শতাব্দীর শেষের দিকে দ্বারকাদাস শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অনুবাদ করিয়াছিলেন গয়ারাম দাস এবং রামলোচন। অনন্তরাম দত্ত এবং রামেশ্বর নন্দী এই দুইজনে স্বতন্ত্রভাবে পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার অংশের অনুবাদ করিয়াছিলেন। নন্দকিশোর দাসের বৃন্দাবন-লীলামৃতকে বরাহপুরাণের ভাবানুবাদ বলা যাইতে পারে। ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৭১৪ শকাব্দে

অর্থাৎ ১৭৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডের অনুবাদ করান।

পুরীর জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যখ্যাপক দুইখানি জগন্নাথ-মঙ্গল কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। কবি দুইজনের নাম বিশ্বম্ভর দাস এবং "দ্বিজ" মধুকণ্ঠ। বিশ্বম্ভর দাসের কাব্যে কলিকাতার মদনমোহনদেবের উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই।

১৮

বৈষ্ণবজীবনী

ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালে শ্রীচৈতন্যের একখানিমাত্র জীবনীকাব্য রচিত হইয়াছিল। পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ (ওরফে প্রেমদাস) ১৬৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত নাটক চৈতন্যচন্দ্রোদয় অবলম্বনে চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী রচনা করেন। প্রেমদাস আর একখানি জীবনীজাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন—বংশীশিক্ষা। ইহাতে কবির গুরুর পূর্ব্বপুরুষ বংশীবদন চট্ট এবং তাঁহার পৌত্র রামচন্দ্র গোস্বামী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। শ্রীচৈতন্য এবং ষোড়শ শতাব্দীর অন্যান্য বৈষ্ণব মহান্ত সম্বন্ধেও কিছু কিছু নূতন কথা আছে। বংশীশিক্ষা ১৬৩৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। পুরুষোত্তম মিশ্রের গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস। এই নামেই তিনি গ্রন্থ দুইটি রচনা করিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জীবনীকার ছিলেন নরহরি (ওরফে ঘনশ্যাম) চক্রবর্ত্তী। ইঁহার পিতা জগন্নাথ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। ইঁহাদের নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে সৈয়দাবাদ গ্রামে। নরহরি বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইঁহার যথেষ্ট কবিত্বশক্তিও ছিল; ইঁহার রচিত পদগুলি হইতে ইঁহার অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে। ছন্দঃসমুদ্র নামে ইনি বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি ছন্দের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। নরহরির সঙ্কলিত পদসংগ্রহ গীতচন্দ্রোদয়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নরহরি তিনচারিখানি জীবনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে অদ্বৈতবিলাসের কথা বলিয়াছি, তাহা ইঁহার রচনা হওয়াই সম্ভব।

নরহরির ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থটিকে বৈষ্ণব-ইতিহাসের মহাকোষ বলা যাইতে পারে। অবিসংবাদিতভাবে এটি হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। প্রেমবিলাসের মত ইহাতে মুখ্যতঃ শ্রীনিবাস আচার্য্যের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইলেও অন্যান্য বহু বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নরোত্তম, শ্যামানন্দ এবং বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদিগের বিষয়ে অনেক সংবাদ ইহাতে পাওয়া যায়।

নরোত্তমবিলাসকে ভক্তিরত্নাকরেব পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। ইহাতে নরহরি প্রধানভাবে নরোত্তমের জীবনী ও কার্য্যকলাপ বিবৃত করিয়াছেন। নরোত্তমবিলাস এবং অধুনালুপ্ত শ্রীনিবাসচরিত্র এই দুইখানি গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরের মধ্যে একাধিকবার উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এ দুটি পূর্ব্বকার রচনা।

শ্যামানন্দের জীবনী বিষয়ে দুইখানি ছোট ছোট কাব্য পাওয়া গিয়াছে; দুইখানিরই নাম শ্যামানন্দপ্রকাশ। এক-খানির লেখকের গুরুদত্ত নাম "কৃষ্ণচরণ দাস।"

বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র জয়দেব ও তাঁহার পত্নী পদ্মাবতীর বিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত। কবি সম্ভবতঃ শ্রীনিবাস আচার্য্য-সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। জয়দেবচরিত্রে কেন্দুবিল্বে বর্দ্ধমানরাজ-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের উল্লেখ আছে। এই মন্দির নির্ম্মিত হয় ১৬১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং বনমালী দাসের কাব্য ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল; কিন্তু যে কত পরে তাহা বলিবার উপায় নাই।

১৯

রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কয়খানি রামায়ণ কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে কবিচন্দ্রের কাব্যের উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। অপর কবিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—রামগোবিন্দ (ওরফে হনুমন্তদাস), মহানন্দ চক্রবর্ত্তী, ভবানী-শঙ্কর বন্দ্য, "ভিক্ষু" রামচন্দ্র বা রামচন্দ্র যতি, রামপ্রসাদ বন্দ্য, "দ্বিজ" ভবানীনাথ এবং "দ্বিজ" সীতাসুত। রামপ্রসাদ বন্দ্যের রামায়ণ রচনা সম্পূর্ণ হয় ১৭১২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি আরও দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, একখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক—কৃষ্ণলীলামৃতরস, অপরটি শক্তিবিষয়ক—দুর্গাপঞ্চরাত্রি। শেষোক্ত কাব্যখানি

সম্পূর্ণ হয় ১৬৯২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে; তখন কবির বয়স বাইশ বৎসর। কবির পিতা জগদ্‌রামের ভণিতাও এই কাব্যটিতে দেখা যায়। সম্ভবতঃ জগদ্‌রাম কাব্য-রচনা আরম্ভ করেন, এবং পুত্র রামপ্রসাদ তাহা সম্পূর্ণ করেন। ইঁহাদের বাসস্থান ছিল দামোদর তীরে, বাণীগঞ্জের অপর পারে ভুলুই গ্রামে। "দ্বিজ" সীতাসুতের কাব্যে মল্লরাজ গোপাল-সিংহের নাম আছে। ইনি দ্বিতীয় গোপাল সিংহ হইলে কাব্যটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত হইয়াছিল।

কয়েকজন কবি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ অথবা রামায়ণের কাহিনীবিশেষ রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—কৃষ্ণদাস, কৈলাস বসু এবং শিবচন্দ্র সেন। ফকিররাম কবিভূষণ অঙ্গদ-রায়বার রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মল্লাব্দ ১০০৮ সালে অর্থাৎ ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখা এই কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ফকিররাম একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের রচনাকাল মল্লাব্দ ১০১৭ সাল অর্থাৎ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে লেখা রামচরিত গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত হইতেছে রামানন্দ ঘোষের কাব্য। রামানন্দ ঘোষ ছিলেন নীলাচলের জগন্নাথদেবের উপাসক, আবার তান্ত্রিক মতে কালীপূজাও করিতেন এবং নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়াও প্রচার করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে যে বিকৃত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, রামানন্দ বোধ হয় সেই মতাবলম্বী ছিলেন।

এই যুগে সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন এই কয় জন—কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ইহার কাব্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি), ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস, "জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ" বাসুদেব (ইনি কোচবিহার অঞ্চলের লোক ছিলেন) এবং ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী। পিতা ষষ্ঠীবরের সহযোগিতায় গঙ্গাদাস একটি মনসামঙ্গল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া দৈবকীনন্দন, কৃষ্ণরাম, রামচন্দ্র খান, গোপীনাথ পাঠক, রাজীব সেন, গোপীনাথ দত্ত এবং আরও কয়েকজন কবি রচিত এক একটি পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত সম্পূর্ণ মহাভারত কাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন। লোকনাথ দত্ত এবং রামনারায়ণ ঘোষ মহাভারতীয় নলদময়ন্তী কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র দাসের কাব্যের বিষয় হইতেছে শকুন্তলার উপাখ্যান।

২০

বিবিধ শাক্ত কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে মনসামঙ্গল কাহিনীর বিশেষ সমাদর ছিল। এই দুই অঞ্চলের বহু কবি মনসামঙ্গল কাব্য অথবা কাহিনীবিশেষ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের নাম করার প্রয়োজন নাই। তবে প্রধান দুইতিনজন মনসামঙ্গল-কবির উল্লেখ করা যাইতেছে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি রামজীবন বিদ্যাভূষণের মনসামঙ্গল

বিরচিত হয় ১৬২৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৩-০৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি একখানি ছোট ব্রতকথাজাতীয় কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন ; কাব্যটির নাম আদিত্যচরিত বা সূর্য্যমঙ্গল। এই কাব্যটি ১৬৩১ শকাব্দে বা ১৭০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। উত্তরবঙ্গের কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র ১৬৬৬ শকাব্দে ১১৫১ সনে অর্থাৎ ১৭৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মনসার পাঁচালী রচনা করেন। অনেক অংশে ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবি জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের অনুসরণ করিয়াছেন। শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহও একখানি মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। ইনি আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—রাজমালা এবং ভারতীমঙ্গল।

কতকগুলি ছোট ছোট ব্রতকথাজাতীয় কাব্য ছাড়াও তিনচারিখানি বড় চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গে রচিত হইয়াছিল। যথা—কৃষ্ণজীবনের অভয়ামঙ্গল বা অম্বিকামঙ্গল, মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা এবং রামানন্দ গোস্বামীর চণ্ডীর গীত। মুক্তারাম সেনের কাব্য রচিত হয় ১৬৬৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে।

চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী বা চণ্ডী অবলম্বনে রচিত কাব্যের সমাদর এই সময়ে আরও বেশী ছিল। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে শিবচন্দ্র সেনের গৌরীমঙ্গল বা সারদামঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র (বা হরিচন্দ্র) বসুর চণ্ডীবিজয় বা দেবীমঙ্গল বা কালিকামঙ্গল, রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল, জগদ্‌রাম ও রামপ্রসাদ বন্দ্য রচিত দুর্গাভক্তিচিন্তামণি এবং হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকা-মঙ্গল।

দীনদয়ালের দুর্গাভক্তিচিন্তামণি দেবীভাগবত-পুরাণ অবলম্বনে রচিত।

কালিকামঙ্গল নামে খ্যাত বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যানকাব্যগুলি বাহ্যতঃ দেবীমাহাত্ম্য খ্যাপন করিলেও ঠিক ভক্তিকাব্যের পর্য্যায়ে পড়ে না। সেইজন্য এই কাব্যগুলি পরে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইতেছে।

২১

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য ও ধর্ম্মপুরাণ

দুইতিনখানি ছাড়া সব ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত। উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা কোন ধর্ম্মমঙ্গল পাওয়া যায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্ম্মমঙ্গলগুলির রচয়িতারা প্রায় সকলেই দামোদর নদের দক্ষিণ ও পশ্চিম এবং দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর এবং পূর্ব্ব এই সীমার মধ্যে বাস করিতেন। তাবৎ ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে ঘনরামের কাব্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর লাভ করিয়াছিল। ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কবিরত্নের নিবাস ছিল বর্দ্ধমানের তিন ক্রোশ দক্ষিণে দামোদরের অপর পারে কৃষ্ণপুর গ্রামে। ইহার পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার নাম সীতা। ঘনরাম বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন, এ কথা কাব্যের মধ্যে পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন। ১৬৩৩ শকাব্দের (অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের) ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে ঘনরাম তাঁহার কাব্যরচনা সমাপন করেন। কবি একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচনা

করিয়াছিলেন। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল বৃহৎ কাব্য। রচনা বেশ প্রাঞ্জল, তবে অনুপ্রাসের প্রয়োগ অত্যধিক।

মল্লভূমের অন্তর্গত চামোট গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্য তাঁহার ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের রচনা সমাপ্ত করেন মল্লাব্দ ১০৩৮ সালে অর্থাৎ ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে। বর্দ্ধমান জেলার শাঁখারী গ্রামনিবাসী নরসিংহ বসুর কাব্যরচনা আরব্ধ হয় ১৬৬৯ শকাব্দের (অর্থাৎ ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের) ১০ই শ্রাবণ তারিখে। হৃদয়রাম সাউ রচিত ধর্ম্মমঙ্গল সমাপ্ত হয় ১১৫৬ সালের (অর্থাৎ ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের) ২রা আশ্বিন তারিখে। ইনি বর্দ্ধমান-বীরভূম সীমান্তের অধিবাসী ছিলেন। রামদাস আদকের কাব্যের রচনাকাল লইয়া গোলযোগ আছে। গোবিন্দরাম বন্দ্যের ধর্ম্মমঙ্গলের একটি পুঁথি মল্লাব্দ ১৭০১ সালে অর্থাৎ ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল, সুতরাং কাব্যটির রচনাকাল ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে। "দ্বিজ" ক্ষেত্রনাথের এবং "দ্বিজ" নিধিরামের কাব্যের অতি অল্প অংশই পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার উপায় নাই।

মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলের অনেক বিশেষত্ব আছে। কবিব নিবাস ছিল বর্দ্ধমান-বাঁকুড়া সীমান্তে বেলডিহা গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম গদাধর, মাতার নাম কাত্যায়নী। মাণিকরাম কাব্যরচনার যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহা অনেকটা রূপরামের আত্মকাহিনীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মাণিক-রামের কাব্যের পুঁথিতে যে রচনাকাল দেওয়া আছে তাহা একটি বিষম সমস্যা। তাহা হইতে অনেকে অনেক রকম তারিখ বাহির করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায়

মহাশয়ের গণনায় পাওয়া যায় ১৭০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ। এই তারিখই যে মোটামুটি ঠিক তাহা অনেক দিক হইতে সমর্থিত হয়।

মাণিকরামের রচনা মন্দ নহে, তবে ঘনরামের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু হাস্যরসের সৃষ্টিতে মাণিকরাম বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মপুরাণ বা অনিলপুরাণ বা ধর্ম্মমঙ্গল পুরাণজাতীয় গ্রন্থ। ইহা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য নহে, ইহাতে লাউসেনের কাহিনী নাই। সহদেবের কাব্য কতক অংশে শিবায়ন, কতক অংশে নাথ-যোগীদের পুরাণ-কাব্য, আর কতক অংশে ধর্ম্মপুরাণ। শেষের অংশে রামাই পণ্ডিতের কাহিনী এবং ধর্ম্মপূজার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধীয় অপর দুইচারিটি কাহিনী আছে। শূন্যপুরাণে উদ্ধৃত নিরঞ্জনের উষ্মা ("রুষ্মা") ছড়াটি এই অংশেই আছে। ধর্ম্মপূজকদিগের ও বৌদ্ধ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সাহায্যে ধর্ম্মান্ধ ফকিরেরা কিরূপে দক্ষিণ রাঢ়ের কোন কোন গ্রাম বিধ্বস্ত করিয়াছিল তাহারই একটি কাহিনী এই ছড়াটির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সহদেব চক্রবর্ত্তীর কাব্য ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অল্পকাল পরেই রচিত হইয়াছিল। সহদেবের পিতার নাম বিশ্বনাথ। ইঁহাদের নিবাস ছিল হুগলী জেলায় দ্বারহাটার নিকটে রাধানগর গ্রামে।

২২

শিবায়ন, সত্যনারায়ণের পাঁচালী এবং বিবিধ কাব্য

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে শিবের গৃহস্থালীর সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনীগুলি মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গলগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল বটে, কিন্তু শিবের বিষয়ে স্বতন্ত্র গানও অপ্রচলিত ছিল না। শিবের বিষয়ে স্বতন্ত্র কাব্য যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনটিই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্বে নহে।

শিবের বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা কাব্য হইতেছে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়ন বা শিবসংকীর্ত্তন। রামেশ্বরের আদি নিবাস ছিল ঘাটাল মহকুমায় বরদাবাটী পরগণায় যদুপুর গ্রামে। পরে কবি কর্ণগড়ের রাজা যশোমন্ত সিংহের আশ্রয়ে মেদিনীপুরের নিকটে অযোধ্যানগরে আসিয়া বাস করেন। রামেশ্বরের শিবায়ন-রচনা সমাপ্ত হয় ১৬৩২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে।

রামেশ্বরের শিবায়ন অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠকাব্যগুলির অন্যতম। রচনাভঙ্গী ভারতচন্দ্রের মত অত সুন্দর না হইলেও ইহার কাব্যে সাধারণ মানুষের ঘরগৃহস্থালীর ব্যাপার অত্যন্ত সহৃদয়তার সহিত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তাহা ছাড়া কাব্যটিতে বিকৃতরুচির বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই। কবি যথার্থই লিখিয়াছেন, "ভবভাবা ভদ্র-কাব্য ভণে রামেশ্বর।"

রামেশ্বর একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যটি শিবায়নের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল; কবি তখনও যদুপুর পরিত্যাগ করেন নাই। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ, এবং সেই কারণে ইহার সমাদরও অত্যধিক।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ আরও দুইজন কবি শিবায়ন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্র এবং রামরাম দাস।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের মত সত্যনারায়ণের পাঁচালীরও উদ্ভব হয় দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে। তবে ধর্ম্মমঙ্গলের মত ইহার প্রসার ঐ স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অল্পকাল মধ্যে ইহা পশ্চিম-বঙ্গের অন্যত্র এবং পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গেও প্রসার লাভ করে। হিন্দুদিগের তরফ হইতে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির সংস্কৃতিগত মিলন প্রচেষ্টার ফলেই এই কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। পীর এবং ফকীরেরা সাধারণতঃ হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরই শ্রদ্ধাভক্তি পাইতেন, এই কারণে পীরের উপাসনা দুই ধর্ম্মের মিলনের সেতুস্বরূপ হইয়াছিল। সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর, পীরের দেবসংস্করণমাত্র, ফলে অতি সহজেই বিষ্ণুর সহিত ইঁহার একীকরণ হইয়া যায়।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী ব্রতকথার মত। প্রাচীন বাঙ্গালার সকল দেবমঙ্গল কাব্যের মধ্যে শুধু এইটিই এখনও পূজার অঙ্গ হিসাবে ব্রতকথার মত পঠিত ও শ্রুত হইয়া থাকে। কাহিনীটি সর্ব্বজনজ্ঞাত বলিয়া এখানে দেওয়া গেল না।

সত্যনারায়ণ কাব্যের প্রাচীনতম কবি হইতেছেন, ধনবাম চক্রবর্ত্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ফকিরবাম কবিভূষণ এবং বিকল চট্ট। তাহার পর "দ্বিজ" বামকৃষ্ণ, ভাবতচন্দ্র রায় গুণাকব (ইনি দুইখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন, একখানির বচনাকাল ১১৪৫ সাল অর্থাৎ ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ), কবিবল্লভ, জয়নারায়ণ সেন (ইহার কাব্যের নাম হরিলীলা, রচনাকাল ১৬৯৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ), ইত্যাদি। রঙ্গপুর জেলাব অন্তর্গত মহীপুব গ্রামনিবাসী বৈষ্ণব কৃষ্ণহরি দাসেব কাব্যেব বিষয় সম্পূর্ণ অভিনব। এই কাব্যে সত্যপীর দেবতা নহেন, তিনি মানুষ, মালঞ্চাব বাজা মহীদানবের কন্যাব গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেন। অনঢ়া কন্যাব গর্ভজাত শিশুকে পবিত্যাগ করা হইয়াছিল। মহীদানবেব পুরোহিত কুশল ঠাকুব শিশুটিকে কুড়াইয়া পাইয়া মানুষ করেন। একদিন বালক সত্যপীব মালঞ্চা নগবীব পশ্চিমে নূব নদীর তীবে একটি পুঁথি কুড়াইয়া পান। কুশল ঠাকুবের নিকট আনিলে তিনি দেখিলেন যে পুঁথিটি কোরান। ব্রাহ্মণের পক্ষে কোরান পাঠ নিষিদ্ধ বলিয়া কুশল বালককে, যেখানে পুঁথিটি পাইয়াছিলেন সেখানে বাখিয়া আসিতে বলিলেন। কুশলেব আদেশ শুনিয়া সত্যপীব তর্ক জুড়িয়া দিল এবং তর্কের ফলে প্রতিপন্ন হইল যে কোবানে পুরাণে ভেদ নাই, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী নহে।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে সত্যপীবের মত ত্রৈলোক্যপীবেব গানও প্রচলিত আছে। মুসলমানদিগের মধ্যে ময়মনসিংহ ও চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে গাজী সাহেবেব গান এবং পশ্চিম বঙ্গ ও মধ্য বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র মাণিকপীরের গান এখনও চলিত

আছে। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে এই গানগুলির বিশেষ কিছু মূল্য নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কবি গঙ্গার মাহাত্ম্য বিষয়ে গঙ্গামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের মূল কাহিনী হইতেছে পৌরাণিক আখ্যায়িকা, ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গাবতারণ। এই সকল কবির গঙ্গামাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য পাওয়া গিয়াছে—গৌরাঙ্গ শর্ম্মা, জয়রাম দাস, "দ্বিজ" কমলাকান্ত, শঙ্কর আচার্য্য এবং দুর্গাপ্রসাদ মুখুটি। দুর্গাপ্রসাদের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে রচিত হইয়াছিল।

সূর্য্যের সম্বন্ধে দুইখানি ব্রতকথাজাতীয় কাব্য পাওয়া গিয়াছে। রামজীবনের সূর্য্যমঙ্গলের উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। এই কাব্য ১৭০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। অপর কবি হইতেছেন "দ্বিজ" কালিদাস।

সরস্বতীর মাহাত্ম্য বিষয়ে দুইখানি মাত্র কাব্য পাওয়া গিয়াছে। একটি হইতেছে দয়ারাম রচিত সারদাচরিত, অপরটি "দ্বিজ" বীরেশ্বর রচিত সরস্বতীমঙ্গল।

লক্ষ্মীমাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্যের মধ্যে "দ্বিজ" ধনঞ্জয়ের কমলামঙ্গল উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গের যে সকল স্থানীয় দেবতার বিষয়ে একাধিক কবিতা, ছড়া বা গান প্রচলিত আছে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন—বৈদ্যনাথ, তারকনাথ, মদনমোহন, যোগাদ্যা এবং কিরীটেশ্বরী। উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গেও এইজাতীয় কবিতা বিরল নহে।

২৩

বিদ্যাসুন্দর কাব্য : ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর সমাদর হইয়াছিল পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, পতনশীল মুসলমান সম্রাট ও নবাব-দিগের দরবারের আড়ম্বর এই অঞ্চলের শিক্ষিত সমাজের মনকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছিল। সমাজও তখন অবনতিপ্রবণ, সুতরাং এ সময়ের বিদ্যাসুন্দর-প্রণয়কাহিনীতে এবং বিকৃতরুচি তরজা ও কবিগানে তখনকার দিনের শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক রুচির পরিচয় মিলিতেছে।

এই সময়ের বিদ্যাসুন্দরকাব্য-রচয়িতা পাঁচজন কবির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—বলরাম কবিশেখর, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন, নিধিরাম আচার্য্য কবিরত্ন এবং প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী। বলরাম কবিশেখরের কাব্যের রচনাকাল জানা নাই; প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর নাম মাত্র জানা আছে। নিধিরাম আচার্য্যের বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হয় ১৬৭৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ দুইজনেই বড় কবি ছিলেন। ইহাদের কাব্য আলোচনার পূর্ব্বে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

সুন্দর নামে এক বিদেশী রাজপুত্র এক মালিনীকে দূতী করিয়া রাজকন্যা বিদ্যার সহিত গোপনে প্রণয় করে। বিদ্যার

মাতা কন্যার গোপন প্রণয়কাহিনী জানিতে পারিয়া স্বামীকে বলিয়া দেন। রাজা কোটালের সাহায্যে সুন্দরকে ধরিয়া ফেলেন এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সুন্দর দেবী কালিকার বরপুত্র, সুতরাং দেবী যথাসময়ে আবির্ভূত হইয়া সুন্দরকে উদ্ধার করেন। সুন্দরের পরিচয় পাইয়া রাজা তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। ইহাই সংক্ষেপে বিদ্যাসুন্দরের গল্প।

এই গল্পের মূল পাওয়া যায় বিহ্লণের চৌরপঞ্চাশিকা নামক সংস্কৃত কবিতায়। পরবর্ত্তী কালে ইহা সংস্কৃত নাটকে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। বররুচির নামিত যে বিদ্যাসুন্দর নাটক পাওয়া গিয়াছে, তাহা অর্ব্বাচীন গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। মূল উপাখ্যানে দেবতার সম্পর্ক ছিল না। পরবর্ত্তী কালে সুন্দরকে দেবীর ভক্ত উপাসক বা বরপুত্র দাঁড় করাইয়া ধর্ম্মের ছাপ দিয়া কাহিনীকে সাধারণের গ্রহণযোগ্য করা হইয়াছে। সেকালে দেবদেবীর কথা না থাকিলে তাহা সাহিত্যই হইত না। ধর্ম্মের রাঙতা-মোড়া হইলেও ইহা যে মূলে লৌকিক কাহিনী ছিল তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না।

বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, এবং ইহার অন্নদামঙ্গল এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কাব্য। ভারতচন্দ্রের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কবিদিগের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান হইতেছে হুগলী জেলায় আধুনিক ভূরশুট, প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠি পরগণায় পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রাম। ইহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় সম্পন্ন জমিদার ছিলেন, পরে ইহার অবস্থা খারাপ হইয়া

যায়। ভারতচন্দ্রের জীবন অশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। নানা দুঃখ কষ্টের পর ইনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পান এবং মূলাজোড়ে বসতি করেন। তথায় ভারতচন্দ্র ১৬৮২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল বা অন্নদামঙ্গলকে "মঙ্গল" জাতীয় মহাকাব্য বলা যাইতে পারে। ঠিকমত বিচার করিলে অবশ্য ইহাকে মঙ্গলকাব্য বলা যায় না, যেহেতু মুখ্যতঃ দেবীর পূজা প্রচারের জন্য লিখিত হয় নাই। এবং পূজা বা ব্রতের আনুষঙ্গিক হিসাবে ইহা পঠিত বা গীত হইবার জন্যও রচিত হয় নাই। কালিকামঙ্গল তিনটি স্বতন্ত্র কাব্যের সমষ্টি; এই তিনটি কাব্য (অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর এবং মানসিংহ) অতি ক্ষীণভাবে একসূত্রে গাঁথা হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল লেখা সম্পূর্ণ হয় ১৬৭৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতচন্দ্র আরও কয়েকখানি ছোট ছোট কাব্য এবং কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে দুইখানি হইতেছে সত্যনারায়ণের পাঁচালী (একখানির রচনাকাল "সনে রুদ্র চৌগুণা" অর্থাৎ ১১৪৪ সাল)। ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার রচনাভঙ্গীতে। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত এবং আরবী-ফারসী শব্দের এমন সুসমঞ্জস প্রয়োগ আর কাহারও রচনায় দেখা যায় নাই। নানারকম সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিয়া কবি অসাধারণ ছন্দোনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। কালিকামঙ্গলের মধ্যে মধ্যে যে গান আছে সেগুলিই বোধ হয় কবিতা হিসাবে ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা।

সুবিখ্যাত শাক্তসাধক ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ সেনের নিবাস ছিল হালিসহরের নিকট কুমারহট্ট গ্রামে। ইহার জীবনী সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী প্রচলিত আছে। রামপ্রসাদের পিতার নাম রামরাম। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভারতচন্দ্র যেমন গুণাকর উপাধি পাইয়াছিলেন রামপ্রসাদও তেমনি কবিরঞ্জন আখ্যা লাভ করেন। রামপ্রসাদও একখানি কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। ইহা ভারতচন্দ্রের কাব্যের পরে রচিত হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শিল্পচাতুর্য্যে এবং ভাষার মনোহারিত্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য শ্রেষ্ঠ হইলেও চরিত্রচিত্রণে রামপ্রসাদের কাব্য হইতে অপকৃষ্ট। রামপ্রসাদ অঙ্কিত চরিত্রগুলি প্রায়ই স্বাভাবিক এবং যথাযথ।

রামপ্রসাদের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কালিকামঙ্গল কাব্য নহে, তাঁহার ভক্তিবিষয়ক সঙ্গীতগুলি। রামপ্রসাদের শ্যামাবিষয়ক গানগুলির রচনার এবং সেগুলির বিশেষ সুরের মধ্য দিয়া কবির ভক্ত হৃদয়ের সাম্যবোধ, দৃঢ় বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আজ প্রায় দুই শত বৎসর পরেও গানগুলির সমাদর ও মর্য্যাদা একটুকুও কমে নাই।

২৪

শৈব সিদ্ধাদিগের গাথা

প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালা দেশে শিব-উপাসক এক যোগি-সম্প্রদায় ছিলেন, যাঁহাদের আদি চারি সিদ্ধা ছিলেন মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা এবং কানুপা। এই চারি সিদ্ধার মাহাত্ম্যসূচক অলৌকিক কাহিনী বা গালগল্প বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। এই কাহিনীগুলি দুই ভাগে পড়ে—(১) মীননাথ-গোরক্ষ-নাথেব কাহিনী এবং (২) গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী। প্রথম কাহিনীতে দেবীর ছলনায় মীননাথের মোহপ্রাপ্তি এবং পরে তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধার বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় কাহিনীর সারমর্ম্ম এই—

রাজা মাণিকচন্দ্রের বিধবা পত্নী ময়নামতী সিদ্ধা হাড়িপার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্য হন এবং পুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রকেও তাঁহার শিষ্য হইতে অনুরোধ করেন। পুত্র অনেক ওজর আপত্তি করিয়া শেষে হাড়িপার কেরামতি দেখিয়া রাজী হইলেন। হাড়িপা গোবিন্দচন্দ্রকে শিষ্য করিয়া যোগী সন্ন্যাসী করিয়া দিলেন। নানাদেশ ঘুরিয়া অশেষ কষ্ট পাইয়া পরে রাজা দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং গুরুর আদেশে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।

এই কাহিনীর মূলে হয়ত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। কিন্তু এখন গল্প হইতে ইতিহাস অংশ বাহির করা অসাধ্য

হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালাদেশের নিজস্ব কথাবস্তু গোবিন্দ-চন্দ্রের সন্ন্যাসের করুণ কাহিনী বাঙ্গালাদেশের সীমানা ছাড়িয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। সুদূর পঞ্জাব, সিন্ধু, মহারাষ্ট্র, রাজপুতনা প্রভৃতি প্রদেশে এই গাথা গাহিয়া এখনও যোগী সন্ন্যাসীরা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বাঙ্গালা দেশে কিন্তু উত্তর বঙ্গ ছাড়া অন্য অঞ্চল হইতে গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত গাথাগুলির মধ্যে যেটি সর্ব্বপ্রাচীন সেটি পশ্চিমবঙ্গের কবি দুর্ল্লভ মল্লিকের রচনা। সহদেব চক্রবর্ত্তীর অনিলপুরাণে মীননাথ গোরক্ষনাথের কাহিনী আছে। ভবানীদাস ও সুকুর মামুদের পাঁচালী উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। এদুটির রচনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হওয়া অসম্ভব নহে।

২৫

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ—যুগসন্ধি

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ভার পাইল এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেশের শাসনভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া দেশের রাজশক্তি করতলগত করিল। ইহাতে বাঙ্গালা-দেশে তথা ভারতবর্ষে নূতন যুগের আবির্ভাব-সম্ভাবনা ঘটিল। এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গলায় গদ্য রচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। শুধু খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় নহে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের চেষ্টাও এবিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে কার্য্যকরী হইয়াছিল। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য স্মৃতি ও ন্যায় শাস্ত্রের

কোন কোন গ্রন্থের বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ কার্য্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। বৈদ্যেরা দুই-একটি কবিরাজী বইও বাঙ্গালা গদ্যে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয় না ঘটিলে এই প্রচেষ্টা যে কতদূর অগ্রসর হইত তাহা বলা শক্ত।

ইংরেজ কোম্পানী রাজ্য পাইয়া দেশের আইনকানুন প্রণয়ন করিতে লাগিয়া গেলেন। ইহাই হইল বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম কার্য্যকর ও ব্যাপক ব্যবহার। তাহার পর বাঙ্গালীকে ইংরেজী এবং ইংরেজকে বাঙ্গালা শিখাইবার আবশ্যকতা অনুভূত হইলে ব্যাকরণ ও অভিধান গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল। হাতে লেখায় এই কার্য্য নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং অনতিবিলম্বে মুদ্রাযন্ত্র ও বাঙ্গালা টাইপের প্রয়োজন অনুভূত হইল। বাঙ্গালা টাইপের ছেনী কাটেন সর্ব্বপ্রথম একজন ইংরেজ। ইনি ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী, নাম চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্; পরে ইনি স্যার চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্ নামে বিখ্যাত হন। উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্ম্মকারকে ছেনী কাটা শিখাইয়া দেন। এইরূপে বাঙ্গালা টাইপের প্রবর্ত্তন হইল। বাঙ্গালা টাইপের প্রথম ব্যবহার হয় হ্যালহেড সাহেব রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণে। বইটি ইংরেজীতে লেখা, প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী হইতে। মুদ্রাযন্ত্রের জন্য বাঙ্গালা অক্ষরের সৃষ্টি হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন যুগের আবির্ভাব হইল এ কথা বলা যাইতে পারে। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে পুস্তক প্রকাশ অনায়াস-সাধ্য ব্যাপার। পূর্ব্বে হাতে-লেখা পুঁথির চলন ছিল একখানি পুঁথি লিখিতে যথেষ্ট সময় এবং প্রচুর অর্থ ব্যয়

হইত। মুদ্রিত পুস্তক সহজলভ্য, সুতরাং মুদ্রাযন্ত্রের দৌলতে সাহিত্যভাণ্ডার ধনী দরিদ্র সকলেরই নিকট উন্মুক্ত হইল। নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া সাহিত্য তখন হইতে সকলেরই সকল সময়ের জন্য উপভোগের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল।

বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠা হইবার পরও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পূর্ব্বের মত বৈষ্ণব পদ, রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল ইত্যাদি ধর্ম্মকাব্য যথেষ্ট রচিত হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের অনুবাদও অনেকগুলি হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান এবং বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে প্রণয়কাহিনী-কাব্য শহর অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল। এই সকল কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। উত্তর এবং পূর্ব্ব বঙ্গে ঐতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত পল্লীগাথা বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতেও প্রচলিত রহিয়াছে। অনেকগুলি চমৎকার গাথার সংগ্রহ ময়মনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ—
কোম্পানী আমল

২৬

বাঙ্গালা গদ্যের আদি যুগ—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক

অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে দুই একখানি আইনের বই বাঙ্গালায় লেখা হইয়াছিল। এইসব বই সাহিত্যের কোঠায় পড়ে না, যথার্থ বাঙ্গালা গদ্যের কোঠাতেও পড়ে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের প্রকৃত আরম্ভ হইল উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম হইতে। বিলাত হইতে সদ্য-আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী, যাহাদের সচরাচর সিভিলিয়ান বলা হইত, তাহাদের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কলেজে প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন শ্রীরামপুরের মিশনারী পাদ্রী উইলিয়াম কেরী। পরবর্ত্তী সালের মে মাসে এই বিভাগে কেরীর সহকারী পণ্ডিত ও মুন্‌সী কয়েকজন নিযুক্ত হন। তখন হইতেই কলেজের প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হইল।

সিভিলিয়ানদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতে গিয়া দেখা গেল যে, বাঙ্গালা গ্রন্থ সবই কাব্য। সাহেবদের প্রয়োজন কথ্য বাঙ্গালা

লেখা, সুতরাং গদ্য পুস্তকই পাঠ্য হিসাবে উপযুক্ত হইবে। এই ভাবিয়া কেরী তাঁহার সহকারী পণ্ডিত ও মুন্‌শীদিগকে দিয়া বাঙ্গালা গদ্য পাঠ্যপুস্তক লেখাইতে লাগিলেন এবং নিজেও একটি ব্যাকরণ, একখানি অভিধান, একখানি কথোপকথনের বই, এবং আর দুই একখানি গদ্যগ্রন্থ রচনা করিলেন। যে বৎসর কলেজের কার্য্যারম্ভ হইল সেই বৎসরেই কেরীর ব্যাকরণ ও কথোপকথন, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত্র এবং গোলক শর্ম্মার হিতোপদেশ প্রকাশিত হয়। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত্রই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বে যে সকল গদ্য গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল সে সবই ইংরেজী অর্থাৎ রোমান হরফে মুদ্রিত। রামরাম বসুর অপর গদ্য গ্রন্থ লিপিমালা বাহির হয় পর বৎসরে, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় চণ্ডীচরণ মুনশীর তোতা ইতিহাস, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম, এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ইনি সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কেরী সাহেবের ইনি দক্ষিণ হস্ত ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুঞ্জয়ের নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলায়, তখন এই অঞ্চল উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। মৃত্যুঞ্জয় কয়েকখানি বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে রাজাবলী এবং প্রবোধচন্দ্রিকা। দেশী লোকের লেখা প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতেছে রাজাবলী। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার

মৃত্যুর অনেক কাল পরে, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, প্রবোধচন্দ্রিকা প্রকাশিত হয়।

কেরী, মার্শম্যান এবং অন্যান্য ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রচারকগণ নিজেরা লিখিয়া অথবা পণ্ডিতদিগকে দিয়া লেখাইয়া লইয়া প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে বাঙ্গালী সম্ভ্রান্ত লোকেরাও অনতিবিলম্বে যোগ দিলেন; ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছেন রাজা রামমোহন রায় এবং মহারাজা রাধাকান্ত দেব। রামমোহন রায় পণ্ডিতদিগের সহিত বিতর্কে যোগ দিয়া বেদান্তদর্শন এবং শাস্ত্রবিচার বিষয়ে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং একটি বাঙ্গালা ব্যাকরণও লিখিয়াছিলেন। রাধাকান্ত দেব নানাভাবে বাঙ্গালা দেশে শিক্ষা, বাঙ্গালা ভাষার বিস্তার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পোষকতা কল্পে অসামান্য সহায়তা করিয়াছিলেন। বিরাট সংস্কৃত অভিধান শব্দকল্পদ্রুম মহারাজার অক্ষয়কীর্ত্তি রূপে বহুকাল বিরাজ করিবে।

এই যুগের গদ্য গ্রন্থ প্রায় সবই হয় সংস্কৃতের নয় ফারসীর নতুবা ইংরেজীর অনুবাদ। দুই একটিমাত্র মৌলিক রচনা। এই সময়ের বাঙ্গালা গদ্যের রূপ ছিল নিতান্তই অমার্জ্জিত। একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা ছাড়া আর কোন লেখার কিছু সাহিত্যিক মূল্য নাই। এগুলির মূল্য এইটুকুমাত্র যে, ইহার মধ্যে বাঙ্গালা গদ্যের শৈশবের অপরিণত রূপ পরিলক্ষিত হইতেছে।

২৭

সাময়িক-পত্রের আবির্ভাব ও প্রভাব : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতাদের দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যের একপ্রকার অনুশীলন হইতে লাগিল বটে, কিন্তু ভাষার উন্নতি বা পরিপুষ্টির কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি ব্যক্তির জন্য লিখিত পাঠ্যপুস্তক বলিয়া জনসমাজে এই গদ্য গ্রন্থগুলির প্রসার হওয়া ত দূরের কথা, সংবাদ পর্য্যন্ত পৌঁছিল না। যাহারা সংবাদ পাইল তাহারাও "খ্রীষ্টানী ব্যাপার" বলিয়া নাক সিঁটকাইয়া জাতি বাঁচাইয়া দূরে দূরে থাকিতে লাগিল। কিন্তু এই খ্রীষ্টান পাদ্রীদের দ্বারাই শীঘ্র এমন এক নূতন বস্তুর প্রবর্ত্তন হইল যাহাতে পঠনক্ষম জনসাধারণ নূতন গদ্য সাহিত্যের প্রতি আর উদাসীন বা বীতরাগ হইয়া থাকিতে পারিল না।

কেরীর উদ্যোগে শ্রীরামপুরের মিশনারী-সম্প্রদায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা সাময়িক-পত্রের প্রবর্ত্তন করিলেন। প্রথমে, এপ্রিল মাসে দিগ্‌দর্শন নামে মাসিক পত্র বাহির হইল, কিন্তু এটি অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর, ২৩শে মে তারিখে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমাচারদর্পণ প্রকাশিত হইল। পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন জন মার্শম্যান নামে মাত্র, দেশীয় পণ্ডিতেরাই সমাচারদর্পণের প্রকৃত সম্পাদকতা করিতেন। সমাচারদর্পণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে (বা অল্প কিছু দিন পূর্ব্বে বা পরে) গঙ্গাকিশোর

ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালা গেজেট অর্থাৎ বেঙ্গল গেজেট বাহির করেন। ইহাই বাঙ্গালীর উদ্যোগে প্রকাশিত প্রথম সাময়িক-পত্র।

সাময়িক-পত্রের মধ্য দিয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথম গদ্য সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে শিখে। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্য সবই পদ্যে রচিত এবং তাহার বিষয়বস্তুও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অথবা সর্ব্বজনবিদিত কাহিনীবিষয়ক। নূতন তথ্য বা নূতন গল্পের রস সে সাহিত্যে পাইবার কোনই উপায় ছিল না। এখন সেই নূতন খবরের বা গল্পের রস বাঙ্গালী পাঠক পাইল সাময়িক-পত্রের সাহায্যে। ফলে নূতন নূতন বাঙ্গালা সাময়িক-পত্রের চাহিদা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল, এবং বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার মুক্ত হইল। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের যথার্থ উদ্ভব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক-দিগের রচিত পাঠ্যপুস্তকে নহে, ইহার ইতিহাস খুঁজিতে হইবে প্রাচীনতম বাঙ্গালা সাময়িক-পত্রিকাগুলির মধ্যে।

সমাচারদর্পণের জনপ্রিয়তার ফলে অচিরে যে সকল সাময়িক ও সংবাদ-পত্রের সৃষ্টি হইল সেগুলির মধ্যে মুখ্যতম হইতেছে সমাচারচন্দ্রিকা। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যা বাহির হয় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে।

সমাচারচন্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) ছিলেন সেকালে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রের একজন দিক্‌পাল। একদিক দিয়া ভবানীচরণ যেমন তাঁহার হাস্যরসপূর্ণ ব্যঙ্গরচনার দ্বারা হিন্দু সমাজের ধনিব্যক্তিদিগের কদাচারকে ধিক্কৃত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, অপর দিকে তেমনি বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া এবং রামমোহন রায়

প্রমুখ প্রতিপক্ষের সহিত শাস্ত্রবিচারে নির্ভীকতা ও যুক্তিযুক্ততা দেখাইয়া হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের রক্ষাকল্পে অশেষ পরিশ্রম করিতে বিন্দুমাত্র কাতরতা প্রদর্শন করেন নাই।

ভবানীচরণ পদ্য ও গদ্য উভয়বন্ধেই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই ধারা, প্রাচীন পদ্যবন্ধ এবং আধুনিক গদ্যবন্ধ, উভয়েরই সম্মিলন ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ-রচনাগুলির মধ্যে ভবানীচরণের নববাবুবিলাস উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। 'টেকচাঁদ ঠাকুর', দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের হাস্যরসিক লেখকগণ সকলেই প্রায় কোন না কোন ভাবে ভবানীচরণের নিকট ঋণী।

ভবানীচরণ যেমন দুই পথে চলিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আরও অগ্রসর হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই যুগের মধ্যে সেতুসংযোগ করিলেন। সে যুগের ইনি ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রসেবী সাহিত্যিক। ১২১৮ সালে অর্থাৎ ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে নৈহাটির নিকটে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাওয়া বেশী দিন ইহার অদৃষ্টে ঘটে নাই; নিজের চেষ্টাতেই ইনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উত্তমরূপে এবং ইংরেজীও কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। ১২৩৭ সালের মাঘ মাস হইতে ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদপ্রভাকর নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে ইনি আরও অনেক সাময়িক-পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সেগুলির কোনটিই সংবাদপ্রভাকরের মত দীর্ঘজীবী হয় নাই। ১২৬৫ সালে অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মাঘ মাসে ইহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

সংবাদপ্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রেব নিজের লেখা ছাড়া তাঁহাব ছাত্রস্থানীয় অল্পবয়স্ক লেখকদিগেব রচনা .প্রকাশিত হইত। পববর্ত্তী কালের অনেক বিশিষ্ট কবি ও গ্রন্থকার সংবাদ-প্রভাকবেব পৃষ্ঠাতেই সাহিত্যসৃষ্টি কার্য্যে শিক্ষানবীশী করিয়াছিলেন। ঈশ্ববচন্দ্র যে ইহাদের সাহিত্যগুরু ছিলেন, একথা ইঁহাবা সগৌববে স্বীকার কবিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্ববচন্দ্রেব কবিত্বশক্তি শৈশবেই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। বালক বয়সে তিনি কবিদলেব জন্য গান রচনা করিয়া দিতেন। পবে তাঁহাব কবিতা সবই সংবাদপ্রভাকর ও অন্যান্য সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। অনেক কবিতা সংস্কৃতের অনুবাদ, দুই চাবিটি ইংবেজী হইতে অনূদিত। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা-গুলি ছয় শ্রেণীতে পড়ে, যথা—(১) ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা বিষয়ক, (২) সমাজ বিষয়ক (হাস্যরস ও ব্যঙ্গপ্রধান), (৩) সমসাময়িক ঘটনা বিষয়ক, (৪) প্রেমমূলক, (৫) ঋতু ও অন্যান্য বর্ণনা-বিষয়ক, এবং (৬) গীতি কবিতা অর্থাৎ গান।

ঈশ্ববচন্দ্রেব বচনাভঙ্গী ছিল, সংবাদপত্রসেবীব যেমন হইয়া থাকে, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসপ্রধান, লঘু, এবং সময়ে সময়ে একটু অশ্লীলতা-ঘেঁষা। সেই জন্য স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে তাঁহার কবিতার মূল্য নিতান্তই কম। কবিতার ছন্দে বিশেষ করিয়া ছড়াজাতীয় কবিতার ছন্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। অনুপ্রাসেব অযথা প্রয়োগ তখনকাব দিনের কবিতার অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল, ঈশ্বরচন্দ্রেব লেখায়ও ইহার ব্যতিক্রম নাই। কবিতা বিচার করিলে দেখি ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন পন্থারই করি; ভারতচন্দ্র তাঁহার কাছে আদর্শ। কিন্তু ভাবের দিক দেখিলে বুঝি ঈশ্বরচন্দ্র আধুনিক পন্থার

প্রথম কবি; সুতরাং এ বিষয়ে তিনিই পথিকৃৎ। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে স্ব-সমাজ ও স্ব-দেশ প্রীতির প্রবর্ত্তন। বাঙ্গালা দেশের এবং বাঙ্গালী সমাজের যাহা কিছু প্রাচীন ও প্রচলিত প্রথা, তাহা যতই নিকৃষ্ট বা কদর্য্য হউক না কেন, সবই তাঁহার নিকট সুন্দর ঠেকিত; গদ্য-পদ্যের মধ্য দিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সামাজিক ব্যঙ্গকবিতার মূলেও এই প্রীতি, এবং প্রাচীন কবিদিগের কাব্য ও জীবনী সংগ্রহেও সেই প্রীতি। প্রধানতঃ এই স্বদেশ ও সমাজ প্রীতির জন্যই তাঁহার ছাত্র শিষ্যগণ তাঁহাকে সাহিত্য-গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, যদিচ তাঁহার রচনার বিকৃতরুচি অনেক সময়ই এইসব কলেজে-পড়া উদীয়মান কবিদিগের নিকট আদরণীয় ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁহার একখানি মাত্র রচনা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। বইটির নাম প্রবোধপ্রভাকর। হিতপ্রভাকর এবং বোধেন্দুবিকাশ তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। শেষের বইটি প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত নাটকের প্রথম তিন অঙ্কের কাব্যানুবাদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ

২৮

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠা

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকেরা পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়া যে গদ্য রীতির প্রবর্ত্তন করিলেন তাহা মোটামুটি একই ভাবে পরবর্ত্তী কালের ইংরেজ ও বাঙ্গালী পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের লেখার ভিতর দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি চলিয়া আসিয়াছিল। একে এই আদিম গদ্যে শ্রী বা ছন্দ কিছুই ছিল না, তাহার উপর চলিত ভাষার শব্দের সঙ্গে অভিধানিক সংস্কৃত শব্দের উৎকট প্রয়োগের আতিশয্য, সর্ব্বোপরি সংস্কৃত কিংবা ইংরেজী ছাঁচে বাক্যগঠন প্রণালী। প্রথম যুগে পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের অনুকরণে বাক্যবিন্যাস করিতেন; তাহা যদিও বা বোঝা যাইত, কিন্তু অধিকাংশ—বিশেষ করিয়া পরবর্ত্তীকালে এই শ্রেণীর সব লেখক—ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিতেন বলিয়া তাঁহারা বাক্য রচনায় হুবহু ইংরেজী রীতি অনুসরণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না, এই হেতু এই গদ্যভঙ্গী ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট একান্ত অবোধ্য ঠেকিত। বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদের মধ্যে এই রীতি এখনও বজায় আছে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের আসর হইতে এই রীতি বহুকাল হইল অন্তর্হিত হইয়াছে। এই

শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ লেখক মনীষী পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫)। বিদ্যাকল্পদ্রুম নামক গ্রন্থমালায় ইনি ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাকল্প-দ্রুমের প্রথম খণ্ড বাহির হয়। সাময়িক পত্রিকার মধ্য দিয়া সাধারণ লোকের বোধগম্য গদ্য প্রবর্ত্তিত হইল বটে, তবে এই রীতির অনেক দোষ ছিল। বাঙ্গালা চলিত শব্দের ও সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগের কোন সুনির্দ্দিষ্ট রীতি ছিল না; বাক্যের বহর অযথা দীর্ঘ হইত, তাহাতে বাক্য সমাপ্তির সময়ে বাক্যের আরম্ভের কথা মনে থাকিত না; বাক্যে ছন্দ বা তাল না থাকায় শ্রুতিমাধুর্য্য একেবারেই ছিল না; বাক্যরচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের রীতিই প্রধানভাবে অবলম্বন করা হইত; এবং ছেদচিহ্নের যথোপযুক্ত প্রয়োগ না থাকায় অর্থগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটিত। এই সকল দোষ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যকে নিতান্ত পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল। এই অকেজো, বিশ্রী গদ্যভঙ্গীর সাহায্যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি একেবারেই অসম্ভব ছিল।

বাঙ্গালা গদ্যের এই সকল দোষ দূরীকৃত করিয়া যিনি ইহার পঙ্গুত্ব মোচন করিয়া ইহাকে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের বাহন করিয়া তুলিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন তিনি আধুনিক বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সন্তান পুরুষসিংহ প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পূর্ব্বে হুগলী জেলার অধুনা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র তেজস্বী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে ১২২৭ সালে অর্থাৎ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আশ্বিন তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, এবং পরিণত বয়সে ১২৯৮ সালে অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে

১৩ই শ্রাবণ তারিখে ইহার তিরোধান ঘটে। ইহার জীবন-কাহিনী সুপরিচিত।

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকুরীতে ঢুকিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যের পাঠ্য-পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার প্রথম গ্রন্থ বাসুদেবচরিত কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের খ্রীষ্টানী মনোভাবের অনুকূল না হওয়ায় প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ বেতালপঞ্চবিংশতির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্যে নূতন যুগ প্রবর্ত্তন হইল, আমরা যে গদ্য এখন লিখিয়া থাকি সেই গদ্য ভূমিষ্ঠ হইল। তাহার পরে বাঙ্গালার ইতিহাস (১৮৪৮), জীবনচরিত (১৮৪৯), শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ বা বোধোদয় (১৮৫১), শকুন্তলা (১৮৫৪), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), মহাভারতের উপক্রমণিকা পর্ব্ব (১৮৬০), সীতার বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩, ১৮৬৮) এবং ভ্রান্তি-বিলাস (১৮৬৯) এই কয়খানি পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। এই বইগুলি সবই হয় হিন্দী, নয় সংস্কৃত, নতুবা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত বটে কিন্তু সেগুলি বিষয়বস্তু ছাড়া সর্ব্বাংশেই নূতন সৃষ্টি, অনুবাদ বলিলে যাহা বুঝি তাহা নহে। অনেকের ধারণা বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা মাত্র। এ ধারণা নিতান্তই ভুল; ইহার স্বাধীন রচনা—সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (দুইখণ্ড), বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার (দুইখণ্ড), বিদ্যাসাগর চরিত (স্বরচিত), প্রভাবতীসম্ভাষণ—সাহিত্য হিসাবে পরম উপাদেয়। শুধু যে সাধুভাষায় গুরুগম্ভীর ছাঁদে লিখিতেই ইনি

দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাও নহে। বেনামীতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকখানি বিতণ্ডামূলক বই লিখিয়াছিলেন, যেমন ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা ইত্যাদি। কথ্য ভাষায় লেখা এই বই-গুলির রচনাভঙ্গী ও রসিকতার তুলনা মিলে না। এই সব বই ছাড়া তিনি উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণকৌমুদী এই দুইখানি সংস্কৃত ব্যাকরণের বই বাঙ্গালায় লিখিয়া বাঙ্গালী ছাত্রদিগের সহজে সংস্কৃত শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। বহু সংস্কৃত গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা সাধুভাষার গদ্যের জনক বিদ্যাসাগর—এ কথাটা একেবারেই অত্যুক্তি নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা গদ্যের বিকৃত কঙ্কালে মেদ মাংস রক্ত সংযোজন এবং প্রাণ সঞ্চারণ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ইহাকে সাধারণ ব্যবহার্য্য জীবন্ত ভাষা রূপে দাঁড় করাইয়া দেন। পদ্যের যেমন ছন্দ ও যতি আছে, গদ্যেরও তেমনি একটা তাল আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গদ্যের তাল লক্ষ্য করেন এবং তদনুযায়ী বাক্য গঠন করিয়া সুললিত গদ্য ভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করেন। পূর্ব্বেকার গদ্যে হয় শুদ্ধ দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃত অথবা চলিত ইতর শব্দের অযথা বাহুল্য থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই দুই-জাতীয় শব্দের প্রয়োগের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন, তাহাতে ভাষার ওজস্বিতা নষ্ট হইল না অথচ রচনার লালিত্য বজায় রহিল। মোটামুটি বলিতে গেলে বাঙ্গালা গদ্যের প্রবর্ত্তনে ইহাই বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব, ইহারই অভাবে ১৮৪৭ সালের পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের বা সাধারণ কাজ কর্ম্মের ভাষা হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে নাই।

বাঙ্গালা গদ্যেব প্রবর্ত্তনে বিদ্যাসাগব মহাশয়ের প্রধান সহযোগী ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)। নবদ্বীপের নিকটে বর্দ্ধমান জেলায় চুপী নামক গ্রামে অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ কবেন। ইঁহার পিতাব নাম পীতাম্বব এবং মাতার নাম দয়াময়ী। বাল্যকালেই অক্ষয়কুমাব কলিকাতায় আসেন এবং ওবিয়েণ্টাল সেমিনাবীতে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন কবেন। অবস্থাগতিকে তাঁহাকে স্কুল ছাড়িতে হয়, তবে নিজের চেষ্টায় গৃহে অধ্যয়ন কবিয়া গণিত, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ কবেন। ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার ইহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং বাব বৎসব ধরিয়া পত্রিকাটি সম্পাদন কবেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়-কুমারেব বিবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধ একত্র কবিয়া তিনি পবে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইঁহার প্রথম পুস্তক বাহ্যবস্তুব সহিত মানব প্রকৃতিব সম্বন্ধ বিচার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৭৭৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে। তাহাব পব এই গ্রন্থেব দ্বিতীয় ভাগ, চারুপাঠ তিন ভাগ, ধর্ম্মনীতি, ভাবতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দুই ভাগ ইত্যাদি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ বচনা ইংরেজী হইতে সংকলিত। ভাবতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্বিতীয় ভাগে ইহাব নিজস্ব কথা অনেক আছে। অক্ষয়কুমারের রচনাভঙ্গী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখার তুলনায় যথেষ্ট নীবস ও লালিত্যহীন হইলেও বৈজ্ঞানিক বিষয় বর্ণনাব পক্ষে অনুপযোগী নহে। সাহিত্যিক হিসাবে অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব হয়ত খুব বেশী

নহে; কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞান আলোচনার পথপ্রদর্শক হিসাবে তাঁহার স্থান বিশেষ উচ্চে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পন্থা অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-১৮৯১) পিতাব নাম জন্মেজয় মিত্র। ইনি অনেকগুলি বৈষ্ণবপদ বচনা করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলালের প্রপিতামহ বাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাদুরও ভক্ত বৈষ্ণব ও কবি ছিলেন। এইরূপ সাহিত্যিক বংশে রাজেন্দ্রলালের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইংবেজী স্কুলে কিছুকাল পড়িয়া রাজেন্দ্রলাল ডাক্তাবী পড়িতে আরম্ভ করেন। ডাক্তারী পরীক্ষায় ইঁহার উত্তরপত্র হারাইয়া যাওয়ায় ইনি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার পর এসিয়াটিক সোসাইটীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ানেব পদে নিযুক্ত হন। এইখানে থাকিয়া তিনি বহু ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করিয়া দেশে-বিদেশে অভূতপূর্ব্ব সম্মান লাভ করেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিয়াও রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চায় অবহেলা করেন নাই। কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক ছাড়া ইনি দুইখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা দুইটি সেকালে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

১২৫৮ সালের অর্থাৎ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে বিবিধার্থসংগ্রহের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এইটিই বোধ হয় প্রথম সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা। বিবিধার্থ-সংগ্রহে রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান, ইতিহাস, রহস্যকাহিনী ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে সাধারণ লোকের পাঠযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। কয়েক বৎসর অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইবার পর বিবিধার্থসংগ্রহ ১৭৮১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উঠিয়া যায়। পর বৎসর হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদকতায় ইহার নব পর্য্যায় প্রকাশিত হয়। ইহাও বেশী দিন টিকে নাই। ইহার দুই তিন বৎসর পরে রাজেন্দ্রলাল রহস্যসন্দর্ভ নামক পত্রিকা বাহির করেন। রহস্যসন্দর্ভের ছয় খণ্ড রাজেন্দ্রলাল সম্পাদন করিয়াছিলেন।

তারাশঙ্কর তর্করত্নের কাদম্বরী সেযুগের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহা বাণভট্টের সংস্কৃত গদ্য কাব্য কাদম্বরী অবলম্বনে রচিত। তারাশঙ্করের অপর পুস্তক রাসেলাসের মূল হইতেছে জনসন সাহেবের রচিত ইংরেজী উপন্যাসখানি।

তারাশঙ্কর তর্করত্নের মত রামগতি ন্যায়রত্নও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ইনি অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক এবং রোমাবতী নামক আখ্যায়িকা রচনা করেন। ইহার রচিত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব নামক বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃত কলেজের অপর এক সুবিখ্যাত ছাত্র দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সেকালের একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। ইহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশ তখনকার দিনে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন অদ্ভুতকর্ম্মা মনীষী। ইনি কয়েকটি মাসিক পত্র পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং বহু বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ ইহার কীর্ত্তি। কালীপ্রসন্নের কথা পরে বিস্তৃতভাবে বলা হইতেছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হইয়াও তিনি স্বধর্ম্মে ও স্বসমাজের আচারব্যবহারে আস্থা কখনও হারান নাই। সেই অনাচার ও অবিশ্বাসের যুগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াও যে তিনি অবিচলিত থাকিতে পারিয়াছিলেন ইহা কম দৃঢ়চিত্ততার পরিচায়ক নহে। ১৮৬৮ সাল হইতে এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ পত্রিকার ভার ভূদেবের হস্তে ন্যস্ত হয়। তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। পুষ্পাঞ্জলি, আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ ইত্যাদি পুস্তকের মধ্য দিয়া দেশহিতৈষণা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, চরিত্রগঠন ইত্যাদির শিক্ষা অতি সুন্দর ও সহজ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এই হিসাবে এই গ্রন্থগুলির আদর চিরকালই থাকিবে। স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস ভূদেবের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

ভূদেব এবং মধুসূদনের সহপাঠী রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০) সাহিত্যিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন না। কিন্তু ইহার ক্ষুদ্র পুস্তক সেকাল আর একাল বাঙ্গালা ভাষার একটী উপাদেয় বই। বইটির ভাষা লঘু এবং মনোজ্ঞ।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সেকালের একজন বিখ্যাত বিদ্বান্ মনীষী ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ ও আইনবেত্তা বলিয়া ইহার খুব

খ্যাতি ছিল। বিদেশী ভাষা হইতে মনোজ্ঞ কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইনি দুই একটি বই লিখিয়াছিলেন। ইহার লিখিত এই কাহিনীগুলি সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালা উপন্যাসের পথ পরিষ্কার করিয়াছিল। কৃষ্ণকমলের দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ সিপাহী-যুদ্ধের সময়ে ১৮৫৭ কিংবা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইনি বিচারক নামে পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় ইহার মৌলিক রচনা ও অনুবাদ প্রকাশিত হইত। ফরাসী হইতে অনূদিত পল-বর্জ্জিনিয়া কাহিনী অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাল্যকালে এই কাহিনী রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

২৯

বাঙ্গালা কাব্যের অভ্যুদয়

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই ধারা সমানে চলিয়া আসিতেছিল। এই দুই ধারা হইতেছে বৈষ্ণব পদাবলী ও পৌরাণিক কাব্য, এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের রীতির লৌকিক কাহিনী কাব্য। ইহার উপর বৈঠকী সঙ্গীত ও তর্জা এবং কবি গান এই দুই তিন রকমের রচনার সমাদর যথেষ্টই ছিল। বৈষ্ণব পদাবলী ও পৌরাণিক কাব্যপদ্ধতির কবিদিগের মধ্যে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হইতেছেন রঘুনন্দন গোস্বামী (জন্ম ১১৯৩ সাল)। ইহার রচিত তিনখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। রামরসায়নে রামায়ণকাহিনী, গীতমালায় কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গীত, এবং

রাধামাধবোদয়ে বিবিধ ছন্দে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে। রামরসায়ন অতি সুললিত কাব্য; ইহা প্রচলিত বাঙ্গালা রামায়ণ কাব্যের সকলগুলি হইতে বৃহৎ। এইটিই কবির প্রথম রচনা বলিয়া অনুমান হয়। রাধামাধবোদয় ১৭৭১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের পদ্ধতিব কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। মদনমোহন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি দুইখানি কাব্য রচনা করেন, রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা। শেষের বইটি সুবন্ধু রচিত সংস্কৃত বাসবদত্তা অবলম্বনে রচিত। ইহাতে মদনমোহন বিশেষ ছন্দঃ-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। ইহার রচিত শিশুশিক্ষা নামক প্রাথমিক তিন খণ্ড পাঠ্যপুস্তকও তখন খুব চলিত। কবিত্ব শক্তিতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মদনমোহন হইতে অনেক বড়। ঈশ্বরচন্দ্র এক হিসাবে পূর্ব্বপদ্ধতির শেষ কবি এবং নূতন পদ্ধতির আদি কবি। দেশপ্রীতি ইহার কাব্যে নূতন ঝঙ্কার তুলিল, তাহাতে তখনকার দিনের উদীয়মান কবি ও শিক্ষিত যুবকেরা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। ঈশ্বরচন্দ্র এবং তাঁহার এই শিষ্যগণের দ্বারাই বাঙ্গালা কাব্যের অভ্যুদয়বার্ত্তা বিঘোষিত হইল।

ঈশ্বরচন্দ্রের শিষ্যেরা তাঁহার সম্পাদিত সংবাদপ্রভাকর ও সংবাদসাধুরঞ্জন পত্রিকায় নিজেদের রচনা প্রকাশ করিতেন। উত্তরকালে অনেকেই কেহ বা কবি কেহ বা নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক হিসাবে যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দ্বারকানাথ অধিকারী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-

পাধ্যায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছু পবিমাণে ঈশ্বর-চন্দ্রের পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা কাব্যে যে আধুনিকতার সূত্রপাত করিলেন তাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্য বঙ্গলালের কবিতায় বিকসিত হইয়া উঠিল। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয় কালনার নিকটে বাকুলিয়া গ্রামে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ কবেন।' রঙ্গলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশচন্দ্রও কবিতা রচনা কবিতেন। রঙ্গলাল ইংরেজী ও সংস্কৃতে সমান ব্যুৎপত্তি লাভ কবিয়াছিলেন। গুরুব মত ইনিও প্রথমে কবিব গান বচনা করিতেন। তখনকাব বিবিধ সাময়িক-পত্রিকায় ইহাব কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। ছোট ছোট মৌখিক কবিতা এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী হইতে অনূদিত কবিতা ও কাব্য ছাড়া ইনি চারিখানি মৌলিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী, শূবসুন্দরী এবং কাঞ্চীকাবেবী। পদ্মিনী কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ; কাব্যটীব বিষবস্তু হইতেছে মেওয়ারের বাণী পদ্মিনী ও সম্রাট অলাউ-দ্-দীনেব কাহিনী। কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরীর বিষয়বস্তুও রাজপুত-ইতিহাস হইতে গৃহীত। কাঞ্চীকাবেরীর মূলে আছে উড়িষ্যার এক রাজকন্যাব প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী।

রঙ্গলালের কাব্যেব মূল সুব হইতেছে দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা। তাঁহার গুরুর কাব্যে দেশপ্রীতি ফুটিয়াছিল বটে, কিন্তু সে প্রীতি আত্মসচেতন ছিল না। তাহা ছাড়া, ঈশ্ববচন্দ্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা অবধি পৌঁছাইতে পারেন নাই। রঙ্গলাল গুরুর অপেক্ষা এক ধাপ

আগাইয়া গিয়াছেন। রঙ্গলালের ভাষাও ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর মার্জ্জিত। রঙ্গলাল অনেক ভাব ইংরেজ কবি স্কট, মূর এবং বায়রনের লেখা হইতে লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন; ঈশ্বরচন্দ্রের ততদূর ক্ষমতা ছিল না। সর্ব্বশেষে, ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদপত্রসেবী ছিলেন, সুতরাং সাধারণ লোকের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে ভাঁড়ামিও করিতে হইত। রঙ্গলালের সে দুর্ভাগ্য হয় নাই। রঙ্গলাল যথার্থই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম কবি। তবে পূর্ব্বের ধারা তিনি একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের প্রথামত তাঁহার কাব্যেও উপাখ্যান এবং বর্ণনাটাই মুখ্য।

দীনবন্ধু মিত্র প্রথমে কবিতা লিখিতেন বটে, কিন্তু পরে তিনি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া যশস্বী হন এবং কাব্য-রচনা ছাড়িয়া দেন। দীনবন্ধুর কবিতায় কোনই বিশেষত্ব নাই। তাঁহার নাটক সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১২৪৪-১৩১৩) নাম করিতে হয়। ইঁহার কাব্য প্রধানত ধর্ম্ম ও নীতি-বিষয়ক। কৃষ্ণচন্দ্রের লেখায় সংস্কৃত এবং ফারসীর ছায়া আছে। ইঁহার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য সদ্ভাবশতক ১২৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। কতকগুলি উৎকৃষ্ট গানও ইনি রচনা করিয়াছিলেন।

৩০

বাঙ্গালা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ

প্রাচীনকালে বাঙ্গালাদেশে যাত্রার ধরণে নৃত্যগীতের অভিনয় হইত। তিন চারিটি পাত্রপাত্রী গীতের সাহায্যে অনুরূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া পৌরাণিক ঘটনাবিশেষের অভিনয় করিত।

যে নট বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার চরিত্র সাজিত (সেকালের ভাষায় "কাচ কাচিত") তাহারই উপর হাস্যরসসৃষ্টির ভার ছিল। এইরূপ অভিনয়ের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাই ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে; শ্রীচৈতন্য তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে রুক্মিনীহরণ অভিনয় করিয়াছিলেন। পাঁচালীর গানে গায়ক চামর ঢুলাইত ও অঙ্গভঙ্গি করিত বটে, কিন্তু তাহা নাটকের অভিনয় নহে, কারণ দ্বিতীয় অভিনেতা ছিল না। কথকতার সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে।

পূর্ব্বকালে যাত্রার কোন বাঁধা পালা ছিল না। শুধু পালার গানগুলি নির্দ্দিষ্ট ছিল, আর কথা অভিনেতারা নিজেরাই যোগাইত। প্রধানতঃ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ লইয়াই সেকালে যাত্রা বা নাটগীত হইত। আর কৃষ্ণলীলার মধ্যে কালিয়দমন কাহিনীই অধিক জনপ্রিয় ছিল, এবং ইহা লইয়া কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ হয় বলিয়া যাত্রা বা কৃষ্ণযাত্রার নামান্তর ছিল কালিয়দমন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে যাত্রা বিশেষভাবে সমাদৃত হইতে থাকে। শ্রীদাম ও সুবল এই দুই ভাই এবং পরমানন্দ অধিকারী কৃষ্ণযাত্রার অভিনয়ে অতিশয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইহাদের অব্যবহিত পর হইতে বাঁধা যাত্রাপালার সৃষ্টি হয়। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়ালা হইতেছেন গোবিন্দ অধিকারী ও কৃষ্ণকমল গোস্বামী। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে কলিকাতা অঞ্চলে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার প্রচলন হইল। এই অঞ্চলের লোকের রুচি তখন অতিশয় বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, একথা ঠিক যে প্রাচীন যাত্রা হইতে বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি হয় নাই। বাঙ্গালা নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে

ইংরেজী ষ্টেজ্ বা নাটমঞ্চ প্রবর্ত্তনের পর হইতে। বাঙ্গালা নাটকের গঠনে ইংরেজী নাটক এবং সংস্কৃত নাটকের প্রভাব তুল্যরূপেই আছে। বাঙ্গালা কথাবার্ত্তা ও গান-যুক্ত নাটক-পালা লইয়া প্রথম অভিনয় হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে। হেরাসিম লেবেডেফ নামে একজন রুশ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি নাট্যশালা স্থাপিত করিয়া তথায় দুইখানি ইংরেজী নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ বাঙ্গালী নট ও নটীদিগের দ্বারা অভিনয় করাইয়াছিলেন। নাটক দুইটিতে ভারতচন্দ্রের গান সংযোজিত হইয়াছিল। প্রথম অভিনয় হয় ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখে এবং শেষ অভিনয় হয় ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে। ইহার পর বহুকাল আর বাঙ্গালা নাট্যশালা অথবা বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এক নাট্যশালা স্থাপিত করেন। দেশীয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত ইহাই প্রথম নাট্যশালা। ইহাতে যে কয়খানি নাটক অভিনীত হইয়াছিল সেগুলি সবই ইংরেজী। তাহার পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে একটি নাট্যশালা স্থাপিত হয়; এখানে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। এই থিয়েটার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই।

বাঙ্গালা নাটকের অভাবেই সেযুগে বাঙ্গালা নাট্যশালা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই; এই অভাব তখন অনেকেই বোধ করিয়াছিলেন। ইহার মোচনের চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে বাঙ্গালা নাটক রচনার সূত্রপাত হইল। ইহার পূর্ব্বে যে দুই একটি সংস্কৃত নাটক বা প্রহসনের অনুবাদ

বাহির হইয়াছিল, সেগুলিকে কাব্যানুবাদ বলাই সঙ্গত ; কোন কোনটিতে কথোপকথন অল্পস্বল্প থাকিলেও তাহা অভিনয়ের জন্য রচিত হয় নাই। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নীলমণি পালের রত্নাবলী নাটিকাই প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা নাটক। তাহার পর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালা নাটক রচনা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়াছে। প্রথম যুগের বাঙ্গালা নাটক অধিকাংশই সংস্কৃত নাটকের গল্প অনুসরণে লিখিত। মৌলিক নাটকগুলির বিষয়বস্তু সব সামাজিক, যেমন বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হরচন্দ্র ঘোষের ভানুমতী-চিত্তবিলাস শেক্‌স্‌পীয়রেব মার্চেণ্ট অব ভিনিস্‌ অবলম্বনে লেখা। কালীপ্রসন্ন সিংহ যে চারিখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাব মধ্যে প্রথম বাবু নাটক ১৮৫৩ কিংবা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নন্দকুমাব রায়ের অভিজ্ঞান শকুন্তল ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৫৭ সালের ৩০শে জানুয়ারী আশুতোষ দেবের বাড়ীতে অভিনীত হয়। মুদ্রিত বাঙ্গালা নাটকেব ইহাই প্রথম অভিনয়।

বাঙ্গালা নাটকের আদিযুগের প্রধান নাট্যকার ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬)। ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং পরে অধ্যাপকও হইয়াছিলেন। নাটক হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও রামনারায়ণের নাটকগুলি অভিনয়ে ভালই উৎরাইত ; নাট্যকার "নাটুকে রামনারায়ণ" নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম নাটক কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এইটি এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নবনাটক ছাড়া রামনারায়ণের আর সকল

নাটকই পৌরাণিক বিষয় অথবা সংস্কৃত নাটক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইনি কয়েকখানি প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন।

নাটক এবং প্রহসন লইয়াই অদ্বিতীয়প্রতিভাসম্পন্ন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংবেজী সাহিত্যেব চর্চ্চা ছাড়িয়া বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বাঙ্গালা সাহিত্যের বোধ করি সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা শুভ দিন। ১২৬৫ সালে অর্থাৎ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শর্ম্মিষ্ঠা নাটক প্রকাশিত হয়। ইহাই বাঙ্গালায় প্রথম উৎকৃষ্ট নাটক। তাহাব পব বৎসব যথাক্রমে নব্য এবং প্রাচীনপন্থীদের বিদ্রূপ কবিয়া একেই কি বলে সভ্যতা? এবং বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ নামক দুইখানি প্রহসন রচিত হয়। এই প্রহসন দুইটি সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরবর্ত্তী কালেব প্রায় সব প্রহসন এই ছাঁচে ঢালা এবং এই দুইটি এখনও অপবাজিত রহিয়াছে। ১২৬৬ সালেই মধুসূদনেব অপব দুইখানি নাটক—কৃষ্ণকুমারী নাটক ও পদ্মাবতী নাটক—প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভার আলোচনা পরে করিব।

মধুসূদন নাটক রচনা পবিত্যাগ করিলে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ নাটক রচয়িতার আবির্ভাব ঘটিল। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ ঢাকা হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া শুধু বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে নহে সমাজে এবং বাষ্ট্রে আলোড়ন উপস্থিত করিল।

কাঁচড়াপাড়ার কয়েক ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে, নদীয়া জেলায় চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৬ সালে অর্থাৎ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম হয়। বাল্যকালে কলিকাতায় ইস্কুলে

পরে হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুকরণে কবিতা রচনা করিতে থাকেন। প্রথম বয়সে রচিত তাঁহার বহু কবিতা ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কলেজ পরিত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু ডাকবিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। চাকুরী হইতে অবসর লইবার বহুপূর্ব্বেই ১২৮০ সালে অর্থাৎ ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দীনবন্ধুর পরম সৌহার্দ্দ্য ছিল।

সেকালে বাঙ্গালা দেশে নীলের খুব চাষ হইত। নীল-করেরা সকলেই ছিল ইংরেজ। তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষীদের উপর অযথা অত্যাচার করিত। নীলদর্পণ নাটকে দীনবন্ধু নীলকরদিগের অমানুষিক অত্যাচারের কিছু কিছু চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। নাটকখানি এরূপ যথাযথভাবে এবং সহৃদয়তার সহিত লিখিত যে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হওয়া মাত্রই দেশে নীলকরদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রকাশিত পুস্তকে দীনবন্ধুর নাম ছিল না, থাকিলে তাঁহার হয় ত চাকুরী যাইত; কারণ সে সময়ে শাসনকর্তৃ-পক্ষের নিকট নীলকর সাহেবদের প্রচণ্ড প্রতিপত্তি ছিল। মধুসূদন নীলদর্পণ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, ইহাতেও তাঁহার নাম ছিল না। প্রকাশক বলিয়া পাদ্রী লঙ্ সাহেবের নাম ছিল। নীলকরেরা লঙের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনিল। বিচারে লঙ্ সাহেবের একমাস কারাবাস ও হাজার টাকা জরিমানা হইল। জরিমানার টাকা কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ দিয়া দিলেন। কিন্তু এত করিয়াও নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলন রোধ করা গেল না;

নীলদর্পণের অনুবাদ বিলাতে পৌঁছিল, সেখানেও আন্দোলন উপস্থিত হইল। এবং অল্পকাল মধ্যেই নীলকরদিগের অত্যাচার প্রশমিত হইল।

নীলদর্পণের পর দীনবন্ধুর এই নাটকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল—নবীনতপস্বিনী (১৮৬৩), বিয়েপাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাইবারিক (১৮৭২), কমলে কামিনী নাটক (১৮৭৩)।

নীলদর্পণ ছাড়া দীনবন্ধুর অপব সব নাট্য-রচনা হাস্যরস-প্রধান নাটিকা অথবা প্রহসন। নবীনতপস্বিনীব মধ্যে শেক্‌স্‌পীয়রের মেরি ওয়াইভ্‌স্‌ অব উইণ্ডসর্‌ নাটকেব প্রভাব আছে। বাঙ্গালায় প্রথম শ্রেণীর নাটক এখনও সৃষ্ট হয় নাই, তবে যাহা হইয়াছে তাহার মধ্যে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ ও সধবার একাদশী অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু। সত্য বটে তাঁহার রচনায় শ্লীলতাব গণ্ডী অনেক সময় উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে দোষ তাঁহার অপেক্ষা সে সময়ের রুচিরই বেশী। সেকালে পাঠক ও শ্রোতা এইরূপ ভাঁড়ামি পছন্দ করিত। কিন্তু ভাঁড়ামি সত্ত্বেও দীনবন্ধুর পাত্রপাত্রী কোথাও খেলো হইয়া পড়ে নাই। নাট্যকারের সহানুভূতি তুচ্ছতম চরিত্রের মধ্যেও ফুটিয়া উঠিয়া তাহাকে কতকটা রক্তমাংসের মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। পরবর্তী নাট্যকারেরা সুযোগ পাইলে বাড়াবাড়ি করিতে ছাড়েন নাই। দীনবন্ধুও কিছু কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি ক্যারিকেচারে পরিণত হয় নাই, জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের দোষগুণ লইয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে।

নাট্যকারের পক্ষে ইহাই ত প্রধান গুণ। এই গুণ দীনবন্ধুর যে পরিমাণে ছিল তাহা বাঙ্গালায় আর কোন নাট্যকারের ছিল না।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে অজস্র বাঙ্গালা নাটক বাহির হইতে থাকে। এই সময়ের নাট্যকারদিগের মধ্যে মনোমোহন বসুর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রথম নাটক রামাভিষেক ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর প্রণয়পরীক্ষা (১৮৬৯), সতী নাটক (১৮৭৩) ইত্যাদি প্রকাশিত হইতে থাকে।

৩১

কৌতুক ও ব্যঙ্গরচনা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনার প্রাচুর্য্য দেখা গিয়াছিল। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবুবিলাস ইত্যাদি এই শ্রেণীরই বই। এই ধরণের ছোট ছোট রচনা সেকালের সাময়িক-পত্রিকায় কিছু কিছু প্রকাশিত হইত। 'টেঁকচাদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামধারী প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা অঞ্চলের ধনি-গৃহের চিত্র লইয়া একটি উৎকৃষ্ট নক্শা বা ব্যঙ্গগল্প প্রকাশ করেন। বইটির নাম আলালের ঘরের দুলাল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ইহা মাসিক পত্রিকা নামক সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকাটি স্ত্রীলোকদিগের সুশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুশিক্ষার অভাবে ধনীর সন্তান কি করিয়া উৎসন্ন যায় ইহাই

আলালেব ঘরের দুলালে দেখান হইয়াছে। গল্পের অপেক্ষা বইটির ভাষা বিশেষ লক্ষণীয়। প্যারীচাঁদ এই গ্রন্থে প্রধানতঃ কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে কিছু কিছু সাধুভাষাব শব্দও আছে। বিদ্যাসাগরের যুগে এইরূপ ভাষা ব্যবহাব করিয়া প্যাবীচাঁদ যথেষ্ট সাহস দেখাইয়াছিলেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই সহজবোধ্য হইলেও এই ভাষার দোষ ছিল যথেষ্ট। ইহা মুখেব ভাষাও নহে, লেখার ভাষাও নহে। তবে পরবর্ত্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ নব্যতন্ত্রেব লেখকদিগের উপব ইহাব যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছিল। আলালের ঘরের দুলালে বাঙ্গালা উপন্যাসেব হয়ত কিছু পূর্ব্বাভাস আছে, কিন্তু ইহার আদর্শ যে ভবানীচরণেব নববাবুবিলাস তাহাতে সন্দেহ নাই। প্যারীচাঁদের অপব উল্লেখযোগ্য রচনা অভেদীব ভাষা অনেকটা সাধুভাষা-ঘেঁষা। এটিকে ধর্ম্মমূলক আখ্যায়িকা বলা যাইতে পাবে।

ইতিপূর্ব্বে একাধিক প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) নাম করিয়াছি। ইনি একজন অদ্ভুতকর্ম্মা বহুমুখী-প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। ত্রিশ বৎসর ব্যাপী স্বল্পপরিসর জীবনের মধ্যে ইনি সাহিত্য, সমাজ ও দেশের হিতকর এত কাজ করিয়া গিয়াছেন যাহা ভাবিলেও বিস্ময় বোধ হয়। তের বৎসর বয়সে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি বঙ্গভাষাব অনুশীলনের জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার তরফে বাঙ্গালায় কাব্য রচনার জন্য মধুসূদন দত্তকে এবং নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য লঙ্ সাহেবকে সংবর্দ্ধিত করা হয়। সভার মুখপত্র বিদ্যোৎসাহিনী

পত্রিকা ছাড়া আরও কয়েকটি পত্রিকা তিনি সম্পাদন করিয়াছিলেন। পাঁচখানি নাটক প্রকাশের পর কালীপ্রসন্ন হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা রচনা করেন। ইহাব প্রথম ভাগ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ভাগ তাহার অল্পকাল পরে প্রকাশিত হয়। সেকালেব কলিকাতার আচার-ব্যবহার পালপার্ব্বণ, সভাসমিতি ইত্যাদি যাহা কিছুতে ভণ্ডামি ও বীভৎসতা দেখিয়াছিলেন তাহা তিনি হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শায় উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত কবিয়া বিদ্রূপের নিদারুণ কষাঘাত কবিয়াছেন। হুতোমের ভাষা যথার্থই কথ্যভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত; ইহা আলালের ঘরেব দুলালেব ভাষার মত মিশ্র ভাষা নহে।

কালীপ্রসন্নের অক্ষয় কীর্ত্তি অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের গদ্য অনুবাদ প্রকাশ। এই কার্য্যে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রমুখ অনেক বড় বড় পণ্ডিতেব সাহায্য পাইয়াছিলেন। মহাভারত প্রকাশ করিতে আট নয় বৎসব লাগিয়াছিল; ইহাব প্রথম খণ্ড ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষ খণ্ড ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৩২

মধুসূদন ও তাঁহার পরবর্ত্তী বাঙ্গালা কাব্য

বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যুগপ্রবর্ত্তক মহাকবি মধুসূদন দত্ত ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে যশোর জেলায় কপোতাক্ষ তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মাতার নাম জাহ্নবী। পিতা-

মাতার একমাত্র জীবিত পুত্র বলিয়া মধুসূদনের শৈশব ও বাল্যকাল অত্যধিক আদরে যাপিত হয়। গ্রামের পাঠশালায় কিছুদিন পড়িয়া মধুসূদন কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। রাজনারায়ণ কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতেন, থাকিতেন খিদিরপুরে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি হিন্দু কলেজে মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন। এখানে মধুসূদন অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ভিতরে যে অসামান্য তেজ এবং তীব্র উচ্চাভিলাষ ছিল তাহা অযথা প্রশ্রয় পাইয়া ইঁহার ভবিষ্যৎ দুঃখদুর্দ্দশার সূচনা করিল। ইংরেজী সাহিত্যের রস এবং ইংরেজ অধ্যাপকদিগের সাহচর্য্য পাইয়া স্ব-সমাজ ও স্বধর্ম্মে মধুসূদনের আস্থা কমিয়া গেল। খ্রীষ্টান হইলে মনেপ্রাণে সাহেব হইতে পারিব এই দুরাশার ছলনায় মধুসূদন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এখন তাঁহার নাম হইল মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাহার পর পাঁচ বৎসর কাল খ্রীষ্টান পাদ্রীদের শিক্ষায়তন বিশপ্‌স্ কলেজে হিব্রু, গ্রীক, লাতিন এবং সংস্কৃত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তাহার পর মাদ্রাজে গিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া ও সংবাদপত্রে লিখিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে থাকেন। কবিজীবনের সূত্রপাতও সেইখানেই। মাদ্রাজে থাকিয়া ক্যাপ্‌টিভ্ লেডী ও ভিজন্‌স্ অব্ দি পাস্‌ট্ নামে দুইখানি ইংরেজী কাব্য রচনা করেন। প্রথমে যে ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন তাঁহার সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় মধুসূদন আবার একটি ইংরেজ মহিলাকে বিবাহ করেন। কিছুকাল পরে পিতামাতার পরলোকগমনের

সংবাদ পাইয়া মধুসূদন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইতি-মধ্যে তাঁহার অধিকাংশ পৈতৃক সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। মধুসূদন পুলিশ কোর্টে চাকুরী করিতে লাগিলেন, এবং ইংরেজীতে কাব্যরচনার প্রয়াস ব্যর্থ জানিয়া মাতৃভাষার অনুশীলনে মনোনিবেশ কবিলেন। বাঙ্গালায় ভাল নাটকের অভাব জানিয়া তিনি প্রথমে নাটক ও প্রহসন রচনায় মন দিলেন ; শর্ম্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৮), একেই বলে সভ্যতা (১৮৬০), বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০) এবং পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০) প্রকাশিত হইল। নাটক বচনা করিতে কবিতে তাঁহার এমন এক নূতন প্রেরণা আসিল যাহাতে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের বাহ্যরূপ একেবারে বদলাইয়া গেল,—তিনি অমিতাক্ষর বা অমিত্রাক্ষব ছন্দেব সৃষ্টি করিলেন। এই ছন্দে রচিত তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ১৮৫৯ সালে বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশিত হইতে থাকে এব, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকাবে বাহির হয়। তাহার পব এই ছন্দে মেঘনাদবধ কাব্য প্রথম (১৮৬১) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৬২), বীবাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), এবং বিচিত্র সমিল ছন্দে ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) প্রকাশিত হইল। কাব্যসৃষ্টির উন্মাদনার কালেও তিনি নাটক রচনা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই ; ১২৬৬ সালে কৃষ্ণকুমাবী নাটক প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই বোধ হয় প্রথম বিয়োগান্ত নাটক বা ট্র্যাজেডি। মৃত্যুর পূর্ব্বে আর দুইখানি নাটক রচনায় হাত দিয়াছিলেন ; একখানি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই, অপর খানি—মায়াকানন—সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার তিরোভাব হয়। বিলাত যাইবার বাসনা মধুসূদনের বরাবরই ছিল,

সুযোগ অভাবে যাইতে পারেন নাই। অবশেষে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাত যাত্রা করিলেন। সেখানে পাঁচ বৎসর থাকিয়া ফরাসী, ইতালীয় প্রভৃতি বিবিধ ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করেন। অর্থাভাবে পড়িয়া বিলাতে যখন তিনি নিদারুণ কষ্ট পাইতেছিলেন তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিয়া উদ্ধার করেন। তাহার সহায়তা ব্যতিরেকে কবির ব্যারিষ্টারী পাশ ত দূরের কথা, প্রাণ বাঁচিত কিনা সন্দেহ। দেশে ফিরিয়া আসিলে বিদ্যাসাগরের নিকট তিনি পিতার মত অভ্যর্থনা ও সহায়তা পাইয়াছিলেন। ফরাসী দেশে থাকিবার সময়ে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কবি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহাই প্রথম সনেট্ বা চতুর্দ্দশপদী কবিতা। মধুসূদনের পর অনেক কবি সনেট্ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই, এমন কি রবীন্দ্রনাথও, মধুসূদনের মত কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া মধুসূদন ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে মোটেই সুবিধা করিতে পারিলেন না। তাঁহার আর্থিক ও মানসিক অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল। ইহার পর তিনি দুইখানি মাত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—হেক্টর-বধ (১৮৭১) এবং মায়াকানন। হেক্টর-বধে কবি বাঙ্গালা গদ্যে প্রাচীন গ্রীসের মহাকবি হোমরের ইলিয়াড্ মহাকাব্যের উপাখ্যানভাগ সঙ্কলন করিয়াছেন। এই দুইখানি পুস্তকে কবির সে প্র গু প্রতিভার শুধু ভস্মাবশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। আশা ভঙ্গজনিত নিদারুণ মনোবেদনা এবং অত্যাচার-উচ্ছৃঙ্খলতাজনিত দেহযন্ত্রণা ও

দারিদ্র্যদুঃখভোগ কবিয়া মধুসূদন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দেব ২৯শে জুন তারিখে স্বর্গারোহণ করেন। বাঙ্গালার অদ্বিতীয় কবিপ্রতিভা আপনার অন্তর্দাহে আপনি দগ্ধীভূত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিল, সম্পূর্ণভাবে স্ফূর্ত্তি পাইবাব সুযোগ ও অবকাশ পাইল না। ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?

হোমাব, ভার্জ্জিল, দান্তে, মিল্‌টন প্রভৃতি ইউরোপীয় কবিগণের মহাকাব্যের অনুসরণে মধুসূদন বাঙ্গালায় মহাকাব্য বচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহা সত্য কথা। কিন্তু মধুসূদনের মহাকাব্য অনুকবণ নহে, ইহা তাঁহাব নিজস্ব সৃষ্টি। বহু ভাষা ও সাহিত্যেব বসবেত্তা কবির লেখার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের যে সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহা অপর কোন বাঙ্গালী সাহিত্যিকেব রচনায় এতাবৎ দেখা যায় নাই। বাল্যকাল হইতেই মধুসূদন রামায়ণ মহাভারতের রসে ওতপ্রোত ছিলেন। ফরাসীদেশে ভের্সাই শহরে বসিয়া তিনি যখন সনেট্ রচনা করিতেছেন, তখনও কাব্যেব বিষয় বলিয়া তাঁহার মনে পড়িতেছে কাশীবাম দাস, বিজয়া দশমী, শ্রীমন্তেব টোপর, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি! রামায়ণ কাব্যের অপরূপ মাধুর্য্যে কবির চিত্ত সারাজীবন ভরিয়া ছিল। ভারতবর্ষীয় শাশ্বত কবিচিত্তের কমলবিহারিণী সীতাদেবীর কথা কবির মানসে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল; একথা তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই,—"অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, বৈদেহি!" "কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি. সুন্দরি, নাহি আর্দ্রে মন যার তব কথা স্মরি, নিত্যকান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে!" তাই বাঙ্গালা সাহিত্যে বীররসের

অভাব দেখিয়া তিনি যখন বীররসাশ্রিত মহাকাব্য প্রণয়ন করিতে সংকল্প করিলেন, তখন স্বভাবতঃই রামায়ণকাহিনীর প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল। মেঘনাদবধ বাঙ্গালায় প্রথম এবং একমাত্র বীররসাশ্রিত মহাকাব্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বীররসের অবতারণা করিবার পক্ষে 'প্রধান অন্তরায় ছিল বাঙ্গালা ভাষার ও ছন্দের ওজোহীনতা। কবি প্রথম দোষ শুধরাইয়া লইলেন প্রচুরভাবে আভিধানিক সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়া এবং নামধাতুর সৃষ্টি করিয়া। আর ছন্দের ওজোহীনতা নিরাকরণ করিলেন অমিতাক্ষর পয়ার প্রবর্ত্তন করিয়া। প্রায় সকল বাঙ্গালা ছন্দের মূলে পয়ার; পয়ারের প্রধান লক্ষণ হইতেছে অষ্টম ও চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর যতি এবং শেষ যতিতে মিল। যতির স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকায় পয়ারে ঝঙ্কারময় ওজস্বী সংস্কৃত শব্দ বেশীমাত্রায় প্রয়োগ করা অসম্ভব ছিল, এবং চরণের শেষে মিল থাকায় বাক্য এবং ভাব দুই চরণে শেষ করিতেই হইত। অসীম প্রতিভাবলে মধুসূদন এই দুই বাধা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিলেন। তিনি যে অমিতাক্ষরের সৃষ্টি করিলেন তাহা মোটেই বিদেশী আমদানি নহে, ইহার মূলে বাঙ্গালা পয়ারেরই ধ্বনিপ্রবাহ এবং নির্দ্দিষ্ট অক্ষরসংখ্যা রহিয়াছে, কেবল অন্ত্য অনুপ্রাস নাই এবং অষ্টম অক্ষরে যতি অবশ্যম্ভাবী নহে। বাঙ্গালা ছন্দঃ স্বীয় বিশিষ্টতা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াই এই অভূতপূর্ব্ব নূতন রূপ পাইল। বাঙ্গালা সাহিত্য নবজন্ম লাভ করিল।

বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে মশগুল থাকিয়া বিদেশী ধর্ম্ম, পোষাক ও আচারব্যবহার অবলম্বন করিলেও মধুসূদন মনে-

প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের আবহমান ধারার সহিত তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির ঐকান্তিক বিচ্ছেদ ছিল না। বৈষ্ণব গীতিকাব্যের সুর ক্ষীণ হইলেও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মধ্যে অনুরণিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে ওজোগুণসম্পন্ন কাব্য মধুসূদনের পরে আর রচিত হয় নাই; মধুসূদনের মত আর কোন কবিই অমিতাক্ষর ছন্দ অতটা সাফল্যের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন নাই। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরের মতই মধুসূদনের কাব্য বাঙ্গালায় উন্নতশীর্ষ এবং একাকী। মধুসূদনের প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মধুসূদনের পরবর্ত্তী দুইজন কবির রচনার মধ্যে বিদেশী কাব্যসুলভ অনুভূতিপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম দেখা মিলিল। এই দুই কবি হইতেছেন বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী (১৮৩৫-১৮৯৪) এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮)। বিহারীলাল সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১২৬৫ সালে ইনি পূর্ণিমা পত্রিকা প্রকাশ করেন, ইহাতে ইহার কয়েকটি কবিতা বাহির হয়। তাহার পর ইনি অবোধবন্ধু পত্রিকা সম্পাদন করেন, ইহাতে বঙ্গসুন্দরী কাব্যের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য সারদামঙ্গলের রচনা আরম্ভ হয় ১২৭৭ সালে, এবং ১২৮৩ সালে আর্য্যদর্শন পত্রিকায় খণ্ডশঃ প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া বিহারীলাল বঙ্গসুন্দরী, সাধের আসন প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বিহারীলাল শব্দশিল্পী ছিলেন না; ভাষাতেও যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল, এবং কাব্যের প্লট্ তেমন ঘোরালো নহে। কিন্তু কবি-অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশই বিহারীলালের কাব্যের অসাধারণতা। ছন্দের লঘুতা ও

লালিত্যেও কবি বেশ নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। সাব্লাইম্ অর্থাৎ বিরাটের মহিমা কবি হিমালয়ের বর্ণনায় যে ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা চমৎকার। বিহারীলালের কাব্য সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথকে কাব্যচর্চ্চায় প্রণোদিত করিয়াছিল। সুতরাং এই হিসাবে বালক রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালেব ভাবগত শিষ্য ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রবন্ধ ও কবিতা বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি বিবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। কয়েকটি ছোটখাট কবিতা ছাড়া ইনি একখানি নাটক ও চারি-পাঁচখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে মহিলা কাব্য। এই কাব্য তিন অংশে বিভক্ত—উপহার, মাতা, ও জায়া। ভগিনী নামক চতুর্থ অংশেরও পত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প কয় ছত্রেব পর আর কবি লিখিবার সুযোগ পান নাই। মহিলা কাব্য রচনা ১২৭৮ সালে আরম্ভ হয়। প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুব পরে। সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বড় কাব্য সবিতাসুদর্শন ১৭৭৫ সালে রচিত এবং ১২৭৭ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যের সহিত বিহারী-লালের কাব্যের একটা সাধর্ম্ম্য আছে; উভয়ের কাব্যেই বর্ণনীয় বস্তুর বাহ্যরূপ অপেক্ষা কবিচিত্তে তাহা যে অনুভূতি বা প্রতিক্রিয়া জাগাইয়াছে তাহার মূল্যই বেশী। এই হৃদয়া-বেগ বিহারীলালের কাব্যে যতটা বাহ্যবস্তুনিরপেক্ষ সুরেন্দ্র-নাথের কাব্যে ততটা নহে। কিন্তু পদলালিত্যে এবং ভাষার সৌষ্ঠবে সুরেন্দ্রনাথের রচনা বিহারীলালের লেখার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিতে হয়। বিহারীলালের কাব্যে বিদেশী কবির

প্রভাব নিতান্তই ক্ষীণ; সুরেন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণভাবে খাটে না।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যরচনায় বর্ণনাত্মক সাবেক রীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের জন্ম হয় ১২৪৫ সালে অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই বৈশাখ এবং মৃত্যু হয় ১৩১০ সালে অর্থাৎ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে। ইহার জন্মস্থান হইতেছে হুগলী জেলায় রাজবলহাটের কাছে গুলটিয়া গ্রাম। কবি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। শেষ বয়সে অন্ধ হইয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন।

বিহারীলালের সম্পাদিত অবোধবন্ধু পত্রে হেমচন্দ্র কবিতা লিখিতেন। বঙ্গদর্শনেও ইহার বহু কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ সালে প্রথম কাব্য চিন্তাতরঙ্গিণী প্রকাশিত হয়। তাহার পর যথাক্রমে নলিনীবসন্ত নাটক (১৮৬৮), কবিতাবলী প্রথম ভাগ (১৮৭০) বৃত্রসংহার মহাকাব্য (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭), কবিতাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, ছায়াময়ী, দশমহাবিদ্যা, রোমিও জুলিয়েট নাটক, এবং চিত্তবিকাশ প্রকাশিত হয়। নাটক দুইখানি যথাক্রমে শেক্সপীয়র প্রণীত টেম্পেষ্ট ও রোমিও-জুলিয়েট অবলম্বনে রচিত। ইতালীয় কবি দান্তের দিভিনা কোমেদিয়া কাব্যের ভাব অবলম্বনে ছায়াময়ী লেখা হয়। বৃত্রসংহার রচনার মূলে মেঘনাদবধের প্রেরণা ছিল। বীররস সর্ব্বত্র জমিয়া না উঠিলেও বৃত্রসংহার যে বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। হেমচন্দ্র বিলক্ষণ ছন্দোনিপুণ ছিলেন। কথ্যভাষায় লঘু ছন্দে সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে কবি বহু সরস ও উপভোগ্য কবিতা

২০

লিখিয়াছিলেন; এগুলি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সর্ব্বোপরি, হেমচন্দ্রের লেখায় স্বদেশপ্রীতি এবং স্বাধীনতাকামনা যতটা নিষ্কপটভাবে ফুটিয়াছে এমন আর কোন বাঙ্গালী কবির কাব্যে প্রকাশ লাভ করে নাই।

হেমচন্দ্রের অভ্যুদয়ের অল্পকাল মধ্যেই নবীনচন্দ্রের (১৮৪৭-১৯০৯) আবির্ভাব ঘটে। ইহার জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলায় নয়াপাড়া গ্রাম। ইনি ডেপুটী কালেক্টরী কার্য্য করিতেন। নবীনচন্দ্র অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে পলাশীর যুদ্ধ (১২৮২ সাল), এবং রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, ও প্রভাস। শেষের কাব্য তিনখানি প্রকৃতপ্রস্তাবে এক বিরাট কাব্যের তিন স্বতন্ত্র অংশ মাত্র। এই তিন কাব্যে কবি অপূর্ব্ব কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে নূতনভাবে ফুটাইয়াছেন, কবির মতে আর্য্য ও অনার্য্য সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং আর্য্য-অনার্য্য দুই সম্প্রদায়কে মিলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরাজ্য সংস্থাপন করেন। নবীনচন্দ্রের কবিত্ব স্থানে স্থানে খুবই চমৎকার, কিন্তু কবি এই চমৎকারিত্ব সর্ব্বত্র বজায় রাখিতে পারেন নাই। এই কারণে কাব্যের মধ্যে বাঁধুনী না থাকায় নবীনচন্দ্রের কবিত্বের ঠিকমত বিচার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। নবীনচন্দ্র গদ্য রচনাতেও হাত দিয়াছিলেন; এই জাতীয় রচনার মধ্যে তাঁহার আত্মকথা—আমার জীবন—সুপাঠ্য গ্রন্থ।

৩৩

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার যুগ

নৈহাটীর নিকটে কাঁটালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে জুন তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রেরা চারি ভাই ছিলেন—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। ইঁহাদের পিতা যাদবচন্দ্র ডেপুটী কালেক্‌টার ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দেন এবং সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাহার পর কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগে ভর্ত্তি হন। এইখান হইতে তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্‌স্ এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি-এ পরীক্ষায় তাঁহার সহিত যদুনাথ বসুও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ পাশ গ্রাজুয়েট। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটী কালেক্‌টারী চাকুরী পান এবং এগার বৎসর পরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বি-এল্ পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

হুগলী কলেজে পড়িবার সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা সুরু হয়। প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ধরণে কবিতা লিখিতেন; কয়েকটি কবিতা ১৮৫২ ও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পুস্তক হইতেছে ললিতা ও মানস। এই দুইটি স্বতন্ত্র কাব্য একত্র ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

কবিতা রচনায় বিশেষ কৃতকার্য্যতা না হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য-সাধনা ছাড়িয়া দেন, এবং কিছুদিনের জন্য সাহিত্যচর্চ্চাও বন্ধ রাখেন। তাহার পব তিনি উপন্যাস বচনায় হাত দেন। সে যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মত তিনি প্রথমে ইংরেজীতে হাত মক্স করিতে লাগিলেন। ১৮৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিনি বাজমোহন্স্ ওয়াইফ্ নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসটি পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ফীলড্ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরেজীতে যতই দখল থাকুক না কেন বাঙ্গালীর মনেব ভাব বাঙ্গালাতেই সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পায়। বিদেশী ভাষায় রচনা ভাল হইলে প্রশংসা পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করা যায় না। ইংরেজী উপন্যাস লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে তাঁহাব প্রতিভা এতদিনে আপনার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। তখন বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় উপন্যাস রচনা আরম্ভ করিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়াব ফলে বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব রসভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল। তাহার পর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃণালিনী বাহির হইল। ১২৭৯ সালে অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন পত্রিকা বাহিব করিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে, বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। বঙ্গদর্শনের প্রথম চারিখণ্ড মাত্র বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহার পর ইহার সম্পাদনের ভার পড়ে তাঁহার মধ্যম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের উপর। বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই বইগুলি প্রকাশিত

হইয়াছিল— বিষবৃক্ষ (১২৭৯), ইন্দিরা (ঐ চৈত্র), যুগলাঙ্গুরীয় (১২৮০ বৈশাখ), সাম্য (১২৮০-৮১), চন্দ্রশেখর (ঐ), কমলাকান্তের দপ্তর (আরম্ভ ভাদ্র ১২৮০), কৃষ্ণচরিত্র (১২৮১ হইতে), রজনী (১২৮১-৮২), রাধারাণী (কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮২), কৃষ্ণকান্তের উইল (১২৮২-৮৪), রাজসিংহ (১২৮৪-৮৫), মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত (১২৮৭), আনন্দমঠ (১২৮৭-৮৯), দেবী-চৌধুরাণী (আরম্ভ পৌষ ১২৮৯, পুস্তকাকারে সম্পূর্ণ)। নবজীবন পত্রিকায় ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং প্রচার পত্রিকায় সীতারাম (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাই বঙ্কিমের শেষ উপন্যাস। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমের অন্যান্য রচনা লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (দুই ভাগ) ইত্যাদিতে পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হয়। ১৩০০ সালে অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে চৈত্র তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

ইংরেজী রোমান্সের অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় যে উপন্যাস রচনার যুগ প্রবর্ত্তন করিলেন আজিও সে যুগের অবসান হয় নাই। ইংরেজীর অনুসরণ হইলেও বঙ্কিমের উপন্যাস সম্পূর্ণ দেশী জিনিষ; ইহার পাত্র-পাত্রী, দেশ-কাল, ঘটনা-পরিবেশ সবই দেশী। গল্প শোনার বাসনা মানুষের মজ্জাগত; এতদিন বাঙ্গালী বিদ্যাসুন্দর কাহিনী, আরব্য উপন্যাস, হাতেম তাই ইত্যাদি পড়িয়া গল্পের পিপাসা কথঞ্চিৎ মিটাইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে বাঙ্গালীর নিজের ঘরের মানুষ অপূর্ব্বভাবে রূপায়িত হইয়া রোমান্টিক স্বপ্নলোকের মধ্যে দেখা দিল; বাঙ্গালীর সাহিত্যপিপাসা চরিতার্থ হইল।

সেই হইতে বাঙ্গালী পাঠকের ভক্তহৃদয়-সিংহাসনে বঙ্কিম অক্ষয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; আজ পর্য্যন্ত কোন লেখক এমন কি রবীন্দ্রনাথও, বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়রাজ্যে এমন অখণ্ড অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা গদ্যের ভাষাও বঙ্কিমের হাতে পড়িয়া আরও লঘু এবং ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠিল। দুর্গেশনন্দিনী সম্পূর্ণ-ভাবে বিদ্যাসাগরী রীতিতে লিখিত; কপালকুণ্ডলা এবং মৃণালিনীর ভাষাও মোটামুটি তাহাই। বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই বঙ্কিম কথ্যভাষার ঢঙ্ মিশাইয়া ও বাক্যের বহর কমাইয়া ছোট করিয়া ভাষাকে লঘু এবং অধিকতর সহজবোধ্য করিয়া তুলিলেন। ইহা বঙ্কিমের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজীশিক্ষিত মনস্বী বাঙ্গালীর প্রধানতম প্রতিনিধি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাসশীল এবং হিন্দু-সমাজের মধ্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন থাকিয়াও যে গোঁড়ামি-বর্জ্জিতভাবে বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তি লইয়া হিন্দুশাস্ত্রের সার্থক আলোচনা করা যাইতে পারে তাহা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব—অনুশীলন ইত্যাদি গ্রন্থে ও অন্যান্য প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সরসভাবে বিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব বিষয়েও তিনি সার্থক আলোচনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সভ্যতাকে জগতের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। বঙ্গদর্শনের প্রকাশ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্যের সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের আসনে বসিয়া রাজদণ্ড

পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে এরূপ একাধিপত্য আর ঘটে নাই।

উপন্যাসরচনার ক্ষেত্রে ত বটেই, সাধারণ গদ্য সাহিত্যেও বঙ্কিমের ধারা তাঁহার সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী লেখকদিগের অধিকাংশই এড়াইতে পারেন নাই। এই কথা স্মরণ রাখিয়া এখন বঙ্কিমযুগের প্রধান সাহিত্যিকদিগের রচনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

বঙ্গদর্শনের লেখকদিগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান সহযোগী ছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (মৃত্যু ১২৯৩ সাল) এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)। দীনবন্ধু মিত্রও বঙ্গদর্শনে কিছু কিছু লেখা দিয়াছিলেন। বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের (১৮৩৪-১৮৮৯) গল্প এবং পালামৌ প্রভৃতি গদ্য রচনার যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। লেখার ভঙ্গী অত্যন্ত সরস; লেখকের সহানুভূতিও প্রগাঢ়। এই দুই মিলিয়া পালামৌ বইটি বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকাহিনী হইয়াছে। অক্ষয়চন্দ্রও সরস গদ্যরচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। ইহার সম্পাদিত সাধারণী ও নবজীবন পত্রিকা সেকালে শিক্ষিতসমাজের মুখপত্র ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে উপন্যাস রচনায় রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) সবিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধেই ইনি বাঙ্গালা উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গবিজেতা (১২৮০ সাল) প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির অপেক্ষা ইহার সামাজিক উপন্যাস দুইটি—সংসার (১২৮২ সাল) এবং সমাজ (১৩০০ সাল)—অধিকতর উপাদেয়। দরিদ্র পল্লীগৃহস্থের সরল সুন্দর

চিত্র তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা (জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় ১২৭৯ সালে প্রকাশিত) ছাড়া আর কোন সমসাময়িক উপন্যাসে দেখা যায় নাই।

ব্যঙ্গ ও রসরচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৫-১৯০৫) বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ রচনায় উল্লেখযোগ্য হইতেছেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১২৫০ সাল-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ)। বঙ্কিম শিষ্যদিগের সর্ব্বকনিষ্ঠ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩২) একজন বিশিষ্ট সুলেখক ছিলেন। ইহার অনবদ্য ঐতিহাসিক চিত্র বেণের মেয়ে (১৩২৬ সাল) পুস্তকে মধ্যযুগের বাঙ্গালা ইতিহাসের এক অন্ধকারময় অংশে উজ্জ্বল আলোকপাত করা হইয়াছে। প্রবন্ধ ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এই যুগের কাব্যরচনার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নাটকরচয়িতাদের মধ্যে তিনটি নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য —জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অমৃতলাল বসু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। সঙ্গীত ও নাটক রচনায়, অভিনয়ে, সঙ্গীত বিদ্যায় ইহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। কাব্য ও সঙ্গীত রচনায় এবং সুরসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ইহার নিকট সার্থক প্ররোচনা ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃতের অনুবাদ। ইহার প্রথম নাট্যরচনা কিঞ্চিৎ জলযোগ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে

প্রকাশিত হয়, তাহার পরবৎসর পুরুবিক্রম নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত অনেকগুলি নাটকের অভিনয় সে সময়ে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র এবং অমৃত-লালের কথা পরে বলিতেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ী শিক্ষা দীক্ষায় ও ঐশ্বর্য্য-বদান্যতায় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজের শীর্ষস্থানীয় হন। ঐশ্বর্য্যের ও ভোগবিলাসের আড়ম্বরের জন্য এই বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঠাকুর "প্রিনস" নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি দুইবার বিলাত যান, ১৮৪২ এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। পর বৎসর বিলাতেই ইহার মৃত্যু হয়। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথ অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তাহার আধ্যাত্মিকতা যেমন গভীর ছিল, সাংসারিক বুদ্ধি, দৃঢ়চিত্ততা ও দূরদর্শিতা তেমনই প্রবল ছিল। দেশের লোকে শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহাকে "মহর্ষি" আখ্যা দিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেকালের ব্রাহ্মসমাজের মূলস্তম্ভ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সমাজসংস্কার কার্য্যে ইহার প্রবল আগ্রহ ও উদ্যোগ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন আচারব্যবহারের মধ্যে যেগুলি ভাল তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই কারণে অতিমাত্রায় প্রগতিশীল ব্রাহ্মগণ স্বতন্ত্র হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিল, দেবেন্দ্রনাথের সমাজ তখন আদি ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া পরিচিত হইল।

দেবেন্দ্রনাথের অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল, ইহারা সকলেই প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ একাধারে কবি এবং দার্শনিক ছিলেন। ইহার স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব। উচ্চ দর্শন-কথা সরল

বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা করিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যমপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে প্রথম সিভিলিয়ান। ইনিও সুসাহিত্যিক ছিলেন। চতুর্থ পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইঁহার নানামুখী প্রতিভা ছিল, নাটকরচনা হইতে চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি নানা বিষয়ে ইনি সমান দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চার মূলে ইহারই প্রেরণা ছিল। দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী বাঙ্গালী মহিলা সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি অনেক ভাল উপন্যাস, গল্প, নাট্যকাহিনী ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন, দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতী পত্রিকা যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় সাহিত্য প্রতিভা আজ পর্য্যন্ত জগতে খুব কমই আবির্ভূত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রদের মধ্যে সুসাহিত্যিক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ। অল্প বয়সে মৃত্যু না ঘটিলে বলেন্দ্রনাথের লেখনীদ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হইত। প্রপৌত্র দীনেন্দ্রনাথ ছিলেন উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুরস্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানের সুর দীনেন্দ্রনাথের সৃষ্টি। দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পৌত্র গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকলায় নবযুগের অবতারণা করিয়াছেন। আধুনিক ভারতীয় চিত্রশিল্পধারার প্রবর্ত্তক ও আদিগুরু অবনীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা গদ্যের এক নূতন ভঙ্গী সৃষ্টি করিয়াছেন। ফল কথা, ঠাকুর বাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শিল্পকলা নবীন প্রেরণায় বিচিত্রভাবে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে এবং

আধুনিক ভারতের জাতীয় সংস্কৃতির উদ্বোধনে অপরিসীম সহায়তা করিয়াছে।

৩৮

বাঙ্গালা নাটকের মধ্যযুগ : গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ

বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৭৭-১৯১১) অভ্যুদয় ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে। ইহার মত উর্ব্বরা লেখনী চালনা করিতে বাঙ্গালা সাহিত্যে খুব কম লেখকই সমর্থ হইয়াছেন। ইনি সর্ব্বসমেত প্রায় আশীখানা নাট্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৃতী নাট্যকার। ইহার নাটক সংস্কৃত অথবা ইংরেজী নাটকের অনুকরণ বা অনুসরণ নহে। বাঙ্গালীর জাতীয় প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইনি স্বতন্ত্র প্রথায় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর মন রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকাহিনীর রসে চিরদিনই পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া আসিয়াছে। শুধু বাঙ্গালীর মন কেন, নিখিল ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা যুগে যুগে পুরাণকাহিনীর আদর্শচরিত্রের ছবি-প্রতিচ্ছবি কাব্যে নাটকে প্রতিবিম্বিত করিয়া আসিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে পুরাণবর্ণিত অনেকগুলি আদর্শচরিত্র অপূর্ব্বভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে।

শুধু পৌরাণিক কাহিনীতে নহে, গিরিশচন্দ্র কতিপয় গার্হস্থ্য চিত্রের এবং বীররসাশ্রিত ঐতিহাসিক উপাখ্যানেরও

অনন্যসাধারণ নাট্যরূপ দিয়া গিয়াছেন। ইহার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে—জনা, পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস, চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল ইত্যাদি।

বাঙ্গালীব মন ভক্তি ও করুণ রসে যত সহজে আর্দ্র হয়, এমন আব কিছুতেই নহে। এই দুই রসেব সৃষ্টিতে গিবিশচন্দ্র বিশেষ নিপুণতা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাব আশীখানি নাটক-নাটিকা-গীতিনাট্যে সাত-আট শতেবও উপর বিভিন্ন চবিত্র সৃষ্টি কবিতে হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়েব বিষয় এই যে, এতগুলি বিভিন্ন চবিত্রেব প্রায় অনেকগুলিই নিজ নিজ বিশেষত্বে ও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। গিবিশচন্দ্র মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরেব সন্তান; গ্রীক-ট্র্যাজেডি লেখকগণেব অথবা শেক্স্পীয়রের দবেব নাট্যকার তাঁহাকে বলা চলে না; তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা এবং পারিপার্শ্বিক অনেকটা সঙ্কীর্ণ ছিল।

আমাদের দেশে নাট্যকাবকে কবি বলা হয় না, সুতরাং সাধাবণ পাঠকে গিরিশচন্দ্রকে কবি বলিয়া জানেন না। তিনি বিশেষ কিছু কাব্যও বচনা কবেন নাই। কিন্তু গান বচনা করিয়াছিলেন অজস্র। গিবিশচন্দ্রেব অনেকগুলি গান চমৎকাব।

গিবিশচন্দ্র শুধুই যে বাঙ্গালাব অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন তাহা নহে, তিনি বাঙ্গালাব একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতাও বটেন। সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীর প্রতিভাব এরূপ সমাবেশ বা মণিকাঞ্চনযোগ সকল দেশেই দুর্লভ।

আমাদের দেশে সাধারণ নাট্যশালা, অর্থাৎ যাহা অবৈতনিক বা সখের থিয়েটার নহে, তাহার প্রতিষ্ঠায়

বাঙ্গালার দুইটি শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভা পরস্পর সহযোগিতা করিয়াছিলেন। এই দুইজন হইতেছেন গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)। অমৃতলালও ছিলেন একাধারে সুদক্ষ অভিনেতা এবং যশস্বী নাট্যকার। সরস রচনায় অমৃতলালেব জুড়ি নাই। ইহার নাট্যগ্রন্থগুলি প্রায়ই লঘুধবণের, হাস্যরসবহুল। গদ্য ব্যঙ্গরচনায়, গল্পে এবং নক্শায় অমৃতলাল বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। বিবাহ-বিভ্রাট, তরুবালা ইত্যাদি গ্রন্থ অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনা।

এই যুগের নাট্যকারদিগের মধ্যে গিরিশচন্দ্র এবং অমৃতলালের পরেই বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ রায়ের নাম করিতে হয়। রাজকৃষ্ণ অজস্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—কাব্য, উপন্যাস এবং নাটক। ইহার কয়েকটি নাটক রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী কালের নাট্যকারদিগের মধ্যে দুইজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (মৃত্যু ১৩৩৪ সাল) অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নাটক এবং উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। ইহার গীতিনাট্য আলিবাবা বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চে চিরনবীন রহিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি এবং নাট্যকার হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অভিনয়ে ভাল উৎরাইলেও ইহার নাটকগুলি নাটক হিসাবে প্রাণহীন। কবি এবং নাট্যকার হিসাবে যত না হউক হাসির গান রচয়িতা বলিয়া দ্বিজেন্দ্র-লাল বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবেন।

৩৫

রবীন্দ্রনাথ

১২৬৮ সালে অর্থাৎ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে বৈশাখ তারিখে কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়। বাল্যকালে গৃহে শিক্ষকদিগের নিকট এবং পরে নিজে পড়াশুনা করিয়া ইনি বাঙ্গালা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। বিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই বলিলেই হয়। সতেরো বৎসর বয়সে বিলাতে গিয়া লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে অল্পকাল মাত্র অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। বাঙ্গালা, ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া ইনি বিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞান শাস্ত্রেরও চর্চ্চা করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সাহিত্যসাধনায় হাত দেন। নিজের সাহিত্য-চর্চ্চার গোড়ার কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি পুস্তকে বলিয়াছেন।

বারো তের বৎসর বয়স হইতেই রবীন্দ্রনাথ গদ্য পদ্য রচনা আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য গ্রন্থ বনফুল ১২৮২ সালে জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় এবং ১২৮৬ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম গদ্য প্রবন্ধ (সমালোচনা) —ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী —প্রকাশিত হয় জ্ঞানাঙ্কুরে ১২৮৩ সালে। বনফুলের পর রচিত হইলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্য কবিকাহিনী ১২৮৬ সালে বনফুলের পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকা বাহির করিলেন।

ভারতী পত্রিকার আসরে কবি জাঁকাইয়া বসিলেন; ইহাতে রবীন্দ্রনাথের গদ্য পদ্য বহু রচনা বাহির হইতে লাগিল। সকল রচনার পরিচয় দিতে গেলে স্বতন্ত্র বই লিখিতে হয়, সুতরাং ইহার পর প্রধান প্রধান কাব্য ও অন্যান্য রচনার কথাই বলিব। ভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের অনুকরণে কয়েকটি ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়া ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে প্রকাশ করেন। বাল্যের রচনা হইলেও অনেকগুলি পদ চমৎকার; বাল্যের রচনার প্রতি কবি যথেষ্ট নির্ম্মমতা দেখাইলেও ভানুসিংহ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতার প্রতি উদাসীন হইতে পারেন নাই। এইগুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতি-কবিতা। বাঙ্গালা সাহিত্যের মূল সুর গীতিকাব্য, যাহা জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্য দিয়া আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে, এবং যাহা রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে নূতন প্রেরণা এবং অপূর্ব্ব রূপায়ন লাভ করিল, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদগুলির মধ্যে তাহারই আগমনী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রকাশিত হইল; এই কাব্যের রচনায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিশিষ্টতা সর্ব্বপ্রথম পরিলক্ষিত হইল। এই হইতে কবি আখ্যায়িকাকাব্য-রচনা ছাড়িয়া দিলেন। তরুণ কবির অপরিণত লেখনীর সৃষ্টি হইলেও কাব্যটির প্রতি সমজদার সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে বিলম্ব হয় নাই; কবি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সংবর্দ্ধনা লাভ করিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ভারতীতে (১২৮৪-৮৫) রবীন্দ্রনাথের

প্রথম উপন্যাস করুণা প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত কাঁচা লেখা বলিয়া এটি আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। দ্বিতীয় উপন্যাস বৌঠাকুরাণীর হাট রচনার সময় গদ্য রচনায় কবির হাত পাকিয়াছে। বৌঠাকুরাণীর হাট পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১২৯০ সালে। ইতিমধ্যে কাব্যরচনায় কবির উত্তরোত্তর প্রতিভা স্ফুরণ হইতেছে। কড়ি ও কোমল কাব্যে (১২৯৩) হৃদয়াবেগের অস্ফুটতা কাটিয়া গিয়াছে, ভাব সুনির্দ্দিষ্ট এবং ভাষা ও ছন্দ সংযত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পরে মানসী কাব্যে (১২৯৭) কবির প্রতিভা স্ফুট বিকাশ লাভ করিয়াছে। কবির তখন পূর্ণ যৌবন, সেই জন্য প্রেমের কবিতাগুলিই মানসীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার পর নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদা রচিত হয়; ইহারও মূল সুর নারীপ্রেম। তাহার পরে প্রকাশিত সোণার তরী কাব্যে ১২৯৮ সালের শেষ হইতে ১৩০০ সালের মধ্যভাগে রচিত কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে কবি ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় সাধনা পত্রিকা বাহির করিলেন। রবীন্দ্রপ্রতিভা তখন মধ্যাহ্ন-গগনে; কবিতায় গানে, গল্পে প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সৃষ্টির প্রাচুর্য্যে অজস্রধারে উৎসারিত হইতে লাগিল; সাধনার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ গদ্যপদ্যের জুড়ি হাঁকাইতে লাগিলেন।

১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের এক নূতন এবং প্রধান ধারার সৃষ্টি করিলেন ছোট গল্প রচনা করিয়া; এই ছোট গল্পের ধারা এখনকার দিনে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবল বেগে বহিতেছে, এবং একাধিক প্রতিভাবান

লেখক ছোট গল্পের মধ্য দিয়া প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্প লেখায় হাত দিবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি দুই একজন সাহিত্যিক গল্প লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র উপন্যাস বা "বড় গল্প" জাতীয় রচনা, ছোট গল্প—ইংরেজীতে যাহাকে বলে শর্ট স্টোরি তাহা নহে। বাঙ্গালায় ছোট গল্পের প্রবর্ত্তন রবীন্দ্রনাথেরই কীর্ত্তি, এবং তাহার ছোট গল্প আজিও বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরাজিত রহিয়াছে। যথার্থ কথা বলিতে কি, রবীন্দ্রনাথ জগতের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প রচয়িতাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছয়টি ছোট গল্প প্রকাশিত হয় হিতবাদী পত্রিকায়। তাহার পর সাধনা পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে প্রত্যেক মাসে ছোট গল্প প্রকাশিত হইতে থাকে। চারি বৎসর পরে সাধনা উঠিয়া গেলে ভারতী পত্রিকায়, এবং পরে বঙ্গদর্শন (নব পর্য্যায়) এবং প্রবাসী পত্রিকায়, এবং আরও পরে সবুজপত্রে রবীন্দ্রনাথের বহু ছোট গল্প প্রকাশিত হইতে থাকে।

সোনার তরীর সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে একটা বুদ্ধি-মূলক আধ্যাত্মিক ভাবের সূচনা হইল। কবির কাব্যপ্রেরণার মূলে যিনি আছেন তিনিই যেন কবিকে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন এবং তিনিই কবির সকল কামনার মূলে রহিয়াছেন, এমন একটা ভাব সোনার তরীর কয়েকটি কবিতার মধ্যে প্রথম দেখা গেল। চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা প্রভৃতি পরবর্ত্তী কাব্যগুলিতে এই ভাব স্ফুটতর হইয়া উঠিল। মানসী হইতে কল্পনা পর্য্যন্ত এই যুগ রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পনৈপুণ্যের যুগ বলা যাইতে পারে। ছন্দের বৈচিত্র্যে

অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্যে ভাবের সমারোহে এই যুগের অনেকগুলি কবিতার তুলনা মিলে না। গদ্যেও তাহাই দেখি; এই সময়ে লেখা গল্পে ও প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রভঙ্গীতে ভাষার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছেন। গদ্যও পদ্যের মত সুষমাযুক্ত এবং ছন্দোময় হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষণিকা কাব্যে (১৯০০) রবীন্দ্রনাথ সুর বদলাইলেন। ভাষার ও অলঙ্কারের আড়ম্বর একেবারে কমিয়া গেল, কবি নিজের মনে যে এক অপূর্ব্ব মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই সহজ ভাষায় হালকা সুরে অনবদ্যরূপে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই কাব্যেরই শেষে যে দুইটি কবিতা আছে তাহাতে কবির আধ্যাত্মিক ব্যাকুলভাব প্রথম প্রকাশ দেখা গেল। এ আধ্যাত্মিক ভাব সোনার তরীর যুগের বুদ্ধিমূলক আধ্যাত্মিকতা নহে। এই ভাবের মূলে আছে ভক্তি, ঈশ্বরপ্রেম। পরবর্ত্তী কালের অধিকাংশ কাব্যে, বিশেষ করিয়া গীতাঞ্জলির কবিতা ও গানগুলির মধ্যে এই ভক্তিভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষণিকার আধ্যাত্মিক ভাব খেয়া (১৯০৬) কাব্যে আরও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাহার পর গীতাঞ্জলি (১৯১০)। এইটি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য না হইলেও ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয় উপন্যাস রাজর্ষি (১২৯৩) রচনার পর রবীন্দ্রনাথ বহুকাল উপন্যাস রচনায় হাত দেন নাই। ১২৯৮ হইতে ১৩০৮ সাল পর্য্যন্ত এই সময়টা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প

ও প্রবন্ধ রচনার যুগ বলা যাইতে পারে। এইগুলি প্রধানতঃ হিতবাদীতে, সাধনায় এবং ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৮ সালে কবি বঙ্গদর্শন নব-পর্য্যায়ের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন, এবং ১৩১৩ সালে তাহা পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার চতুর্থ ও পঞ্চম উপন্যাস—চোখের বালি এবং নৌকাডুবি —বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। উপন্যাস রচনার মধ্যে এখন যে ভঙ্গী চলিতেছে তাহার সূত্রপাত চোখের বালিতে। ষষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস গোরা প্রথম প্রকাশিত হয় প্রবাসী পত্রিকায় (১৩১৪-১৬)। গোরার ভাষা পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেকটা হালকা ছাঁদের। তাহার পর প্রবাসীতে (১৩১৮-১৯) কবির জীবনস্মৃতি বাহির হইল। ইহার ভাষা গোরার ভাষা হইতে আরও আড়ম্বরবর্জ্জিত, আরও সুমধুর। জীবনস্মৃতি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদ্য গ্রন্থ। ইহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এক নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। ভক্তিমূলক আধ্যাত্মিক কবিতারচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সিঁড়িভাঙ্গা পয়ার ছন্দে বর্ণনাত্মক ও চিন্তামূলক কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন ; অনেকটা যেন সোনার তরীর যুগের পুনরাবৃত্তি ঘটিল। কথ্যভাষার ছঁদে তিনি অনেকগুলি গল্প এবং একটি উপন্যাসও রচনা করিলেন। উপন্যাসটির নাম ঘরে বাইরে। এ যুগের অধিকাংশ লেখা শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৩২১ হইতে)। ইহার পরেও রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি উপন্যাস বা বড় গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে যোগাযোগ এবং শেষের কবিতা। সবুজপত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি বলাকা কাব্যে গ্রথিত হইয়াছে। ভাবের ঐশ্বর্য্যে এবং শিল্পনৈপুণ্যে

বলাকা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির অন্যতম। ইহার পরে যে সকল কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হইতেছে পলাতকা, পূরবী, প্রবাহিনী, শিশু ভোলানাথ, ইত্যাদি। কাব্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ এ যাবৎ বহু নূতন নূতন ভাব ও ঢঙের সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি "গদ্য" কবিতার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; এই শ্রেণীর রচনায় মিল এব সুনির্দ্দিষ্ট যতিবিভাগ নাই, গদ্যকে পদ্যের মত সাজাইয়া পড়িলে যেমন হয় তাহাই। ইহাকে ঠিক কবিতা বলা চলে কিনা সন্দেহ। সদ্যঃপ্রকাশিত প্রান্তিক কাব্যে ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত নূতন কবিতাগুলিতে দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথ "গদ্যকবিতা" রচনার মোহ কাটাইয়া উঠিতেছেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদের জন্য রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যের নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। এখনকার দিনে সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এই পুরস্কারপ্রাপ্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। ইহার কিছু পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে "ডক্টর অব্ লিটারেচার" উপাধি প্রদান করেন। তাহার পর দেশে বিদেশে—বিশেষ করিয়া ইউরোপে—ইনি যেরূপ অভূতপূর্ব্ব সম্মানলাভ করিয়াছেন তাহা আর কোনও দেশের কোনও কবির অদৃষ্টে ঘটে নাই। আধুনিক জগৎ রবীন্দ্রনাথকে শুধু শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াই সম্মান করে না, জ্ঞানগুরু আচার্য্য বলিয়াও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

বাঙ্গালা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে নূতন শ্রী আনয়ন করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কবিতার ছন্দে ও ভাবে, গানের সুরে,

গদ্যের লালিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়াছেন, তাহার ফলে বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি আধুনিক ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ত বটেই, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সত্য বটে যে, রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা পদ্য ও গদ্যের ভাষায় ইংরেজী ইডিয়ম কিছু কিছু প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহা এমন বেমালুম ভাবে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে যে, আর বিদেশী বলিয়া চিনিবার যো নাই। ভাষার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি ত এমনি করিয়াই হয়। অন্য ভাষার শব্দ ও প্রয়োগরীতি কিছু কিছু আত্মসাৎ করিয়া তবে ভাষার প্রসারলাভ হইয়া থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের লেখায় কম দেখা যায় না। কালিদাসের কবিতার, বিশেষ করিয়া মেঘদূতের, ইনি অসাধারণ ভক্ত। উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত ধর্ম্ম ও কাব্য সাহিত্যের সহিত ইহার ধারাবাহিক পরিচয় আছে। সেই জন্য ববীন্দ্রনাথের কাব্যে ভাবতবর্ষীয় আধ্যাত্মিক চিন্তা-ধারার প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির প্রতি ইঁহার অসাধাবণ শ্রদ্ধা। সেকালে তপোবনে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচারী বালকেরা শিক্ষা লাভ কবিত। এই আদর্শের অনুসরণে ইনি বোলপুরের নিকটে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এই বিদ্যালয় এখন বিশ্বভারতীতে বিরাট পরিণতি লাভ করিয়াছে। এখানে স্কুল-কলেজের বিদ্যা, প্রাচ্য ভাষা ও ধর্ম্মবিষয়ক গবেষণা এবং সঙ্গীত ও চিত্রকলার অনুশীলন হইয়া থাকে। ইহার সংলগ্ন শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানে কৃষি ও উটজশিল্পের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বিশ্বভারতী এখন

ভারতবর্ষে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান বিশেষত্ব—অর্থাৎ যাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবিদের হইতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় তাহা—হইতেছে এই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিষয়বস্তু, তাহা বহিঃ-প্রকৃতি হউক বা কোন ভাব অর্থাৎ আইডিয়া হউক, কবির মনে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত করিয়াছে সেই অনুভূতিরই প্রকাশ। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের কাব্যে বিষয়বস্তুরই প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত কাব্যধারায় কবিচেতনা বিষয়বস্তুর মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া এক অখণ্ডরূপ লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বের কাব্যরীতিতে কবিচিত্ত বিষয়বস্তু হইতে অনেকটা নিরপেক্ষ হইয়া দর্পণের মত শুধু আদর্শ প্রতিবিম্বিত করিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত কাব্যরীতিই এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবে চলিতেছে। দুই একটি ব্যতিক্রম যাহা সম্প্রতি দেখা যাইতেছে তাহা অনেকটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট বা "নূতন কিছু" করার মত।

৩৬

রবীন্দ্র-সমসাময়িক আধুনিক যুগ ঃ শরৎচন্দ্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাঙ্গালা কাব্যে অনুভূত হইতে থাকে ; বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে সেই প্রভাব একচ্ছত্র হইয়া পড়িয়াছে। গদ্যরীতিতে এই প্রভাব পড়িতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। এখন কিন্তু রবীন্দ্ররীতি এড়াইয়া গদ্য-পদ্য রচনা করা অতিবড় শক্তিশালী

সাহিত্যিকের পক্ষেও অসম্ভব। সম্প্রতি কেহ কেহ অতি আধুনিক ইংরেজী কাব্যের মাছিমারা অনুকরণে কবিতা রচনার প্রয়াস করিতেছেন; কিন্তু এই সকল কবিতার ভাষা না-ইংরেজী না-বাঙ্গালা, ভাব উদ্ভট ও উৎকট, এবং এগুলিকে কাব্যপর্য্যায়ে স্থান দিতে হইলে নূতন ধরণের সাহিত্যরুচি ও সাহিত্যাদর্শ গঠন করিতে হইবে। কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা এবং ভাষায় উপযুক্ত দক্ষতা না থাকিলে শুধু অভিনবত্বের অবতারণা করিলেই যে কবিতা রচনা হয় না, তাহা এই শ্রেণীর সাহিত্যিকেরা প্রায়ই ভুলিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রযুগের আওতায় পড়িয়াও যাঁহারা কাব্যরচনায় অল্পবিস্তর মৌলিকত্ব দেখাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মুখ্যতম হইতেছেন অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৯), দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। অক্ষয়চন্দ্র মোটামুটি প্রাচীনপন্থী ছিলেন বলা যায়, ইহার কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ প্রধান ভাবে ছিলেন ছন্দঃশিল্পী; তিনি ছন্দে অনেক নূতনত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। বিদেশী কবিতাকে ভাব ও ভাষা সমেত বাঙ্গালায় আত্মসাৎ করিতে তাঁহার মত দক্ষতা আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩ ১৯১৩) নাট্যকার হিসাবে খুব খ্যাতি ছিল; কবিতা ও হাসির গান রচনায় তিনি আরও ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কয়েকটি উৎকৃষ্ট গীতিনাট্য ও নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

প্রবন্ধরচনায়, বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানবিষয়ে, রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী মহাশয়ের (১৮৬৪-১৯১৯) জুড়ি অদ্যাবধি বাঙ্গালা সাহিত্যে আবির্ভূত হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে উপন্যাস এবং বড় গল্প রচনায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার নূতনত্বের অবতারণা করিয়াছিলেন। ইহার গদ্যভঙ্গী যেমন অনাড়ম্বর তেমনি হৃদয়গ্রাহী। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে উপন্যাসক্ষেত্রে নবাগতের মধ্যে দুইজন অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৩০) ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩৮)। রাখালদাসের অধিকাংশ উপন্যাস ঐতিহাসিক। এই উপন্যাসগুলিতে গুপ্ত, পাল ও মোগল-যুগের ইতিহাসকে সজীব করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরা হইয়াছে। যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বাঙ্গালায় একমাত্র রাখালদাসই লিখিয়াছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেণের মেয়ে ঠিক উপন্যাস না হইলেও এই শ্রেণীর একটি উপাদেয় গ্রন্থ।

ছোট গল্পের আসরে আমরা বিংশ শতাব্দীতে চারিটি প্রধান লেখককে পাইতেছি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় ছোট গল্পের ফসল আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে যেমন হইয়াছে এমন কাব্য, নাটক বা উপন্যাস কোন বিষয়েই হয় নাই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭০-১৯৩৩) গল্প অনাড়ম্বর ও মধুর। রবীন্দ্রনাথের পরেই ইনি বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প লেখক। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্ভুত রসের স্রষ্টা। ইহার কঙ্কাবতী উপন্যাসে (১২৯৯) অপরূপ রূপকথার রাজ্যে সম্ভব-অসম্ভবকে বিশেষ নিপুণতার সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ত্রৈলোক্যনাথের মুক্তামালা ও ডমরুচরিত বাঙ্গালা সাহিত্যের নব্য আরব্য-উপন্যাস। স্বল্প আয়োজনে

অনাবিল হাস্যরসের সৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথের সমকক্ষ এখনও কেহই আবির্ভূত হন নাই। করুণ রসের সমাবেশেও ইনি যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ময়না কোথায় উপন্যাসে। ত্রৈলোক্যনাথের সহযোগিতায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা এন্‌সাইক্লোপীডিয়া বিশ্বকোষের পত্তন করেন।

আধুনিককালে বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বাধিক জনপ্রিয় গল্প ও উপন্যাস রচয়িতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যে আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তাঁহার রচনার সমাদরও তেমনি অসম্ভাবিত। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত রচনা বড়দিদি ভারতী পত্রিকায় (১৩১৭ সাল) প্রকাশিত হয়। তাহার তিন চারি বৎসর পরে যমুনা পত্রিকায় বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট ও বড় গল্প এবং চরিত্রহীন উপন্যাসের কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। তাহার পর ভারতবর্ষ পত্রিকায় শরৎচন্দ্র আসর জাকাইয়া বসিলেন; বিরাজ বৌ, অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ, শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি গল্প বাঙ্গালী পাঠকের মনোহরণ করিয়া লইল। সেই হইতে মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্রের লেখনী অজস্র গল্প উপন্যাস রচনা করিয়া বাঙ্গালী পাঠক-সাধারণের মন পরিতৃপ্ত করিয়া আসিয়াছে। তাঁহার শেষের লেখাগুলি পূর্ব্বেকার লেখার তুলনায় অপকৃষ্ট, কেননা ইদানীং তিনি একশ্রেণীর সাহিত্যিক এবং পাঠকের মুখ চাহিয়া লেখনী ধারণ করিতেন।

শরৎচন্দ্রের গদ্যভঙ্গী মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের লেখার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার এমন কয়েকটি নিজস্ব গুণ আছে

যাহা অন্য কাহারও লেখায় দেখা যায় নাই। শরৎচন্দ্রের লেখা অত্যন্ত সবল, ভাব প্রকাশ করিবার পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত একটি কথার প্রয়োগ নাই, অথচ ইহা রসহীন কথোপকথনের ভাষা নহে। আসল কথা হইতেছে, শরৎচন্দ্রের ভাষা বিষয়বস্তুর একান্ত অনুগত।

রবীন্দ্রযুগের মধ্যাহ্নে উদিত হইয়াও শরৎচন্দ্র যে নিজের স্নিগ্ধ কিরণজাল বিস্তারিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। সাহিত্যশিল্প হিসাবে তাঁহার সব গল্প ও উপন্যাস হয়ত নিঁখুত নহে; কিন্তু শরৎচন্দ্রের অনন্য-সাধারণ বিশেষত্ব হইতেছে দুঃখী-দরিদ্র-নিপীড়িতের প্রতি অজস্র সহানুভূতি। এই সহানুভূতি বাহিরের তৃতীয় ব্যক্তির নহে, অনুকম্পাও নহে, তাহাদের একজন হইয়া শরৎচন্দ্র যে সহানুভূতি মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই তিনি মনোজ্ঞ ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্র-নাথের সহানুভূতি কিছু কম নহে, কিন্তু তিনি একান্তভাবে কবি, তাঁহার চিত্তের প্রসার অপরিসীম বৃহৎ এবং ব্যাপক; তিনি যে দুঃখ-বেদনা অনুভব করিয়া কাব্যে ও গল্পে-উপন্যাসে প্রতিফলিত করিয়াছেন, তাহা তীব্রতা-মাত্রহীন, তাহা "রস"। রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ রসস্রষ্টা, তাঁহার রসসৃষ্টিতে আমাদের আত্মার সৌন্দর্য্যবোধ চরিতার্থ হয়, কিন্তু সে রস-সৃষ্টিতে আমাদের প্রাত্যহিক জগতের স্থূল মন সব সময় পরিতৃপ্ত হয় না। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে ও উপন্যাসে আমরা পাই প্রধানতঃ এবং প্রচুরভাবে কাব্যরস। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যেও এই জিনিষই পাওয়া যায়, কিন্তু যথেষ্ট তরল ভাবে; এবং তাঁহার অধিকাংশ

জনপ্রিয় রচনার কাব্যের রস যত না আছে, তাহার বেশী আছে গল্পের মোহ।

শরৎচন্দ্র যাহাদের সুখ দুঃখ চিত্রিত করিয়াছেন, তিনি যেন তাহাদেরই একজন—এই সমবেদনাই শবৎসাহিত্যোব মূল কথা। শবৎচন্দ্রের সৃষ্ট চবিত্রগুলির কোন মাহাত্ম্য নাই, তাহাবা পাঁচপাঁচি মানুষ, দবিদ্র, সাধাবণ লোক। এই সমাজের সহিতই তাঁহার আত্যন্তিক পবিচয় ছিল বলিয়া ইহাদের ছবি তিনি মন দিয়া জ্বলন্তভাবে আঁকিতে পারিয়াছিলেন, এবং এই চিত্রই পাঠক সাধাবণেব মন অনায়াসে হরণ করিয়া লইতে পাবিয়াছে। ধনী বা অভিজাত সমাজেব অভিজ্ঞতা শবৎচন্দ্রেব ছিল না, সেই জন্য যেখানে এই সমাজের চিত্র আকিয়াছেন সেখানে তিনি আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সাংসাবিক অভিজ্ঞতা শবৎচন্দ্রের যতটুকু ছিল তাহা গভীব ছিল বটে কিন্তু বিশেষ ব্যাপক ছিল না। এই কাবণে তাঁহাব অতগুলি গল্প-উপন্যাসেব মধ্যে আমরা প্রায়ই একই নাবীচবিত্রের পুনবাবৃত্তি দেখিতে পাই।

অতি আধুনিক সময়ে বাঙ্গালা দেশে অনেক শক্তিশালী সাহিত্যিক বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন এবং কবিতেছেন। তাঁহাদেব সকলেব সাহিত্যপ্রচেষ্টার আলোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থেব স্বল্প পবিসরের বাহিবে॥

প্রধান প্রধান প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের কালানুক্রমিক নির্ঘণ্ট

দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী

বৌদ্ধগান ও দোহা।

পঞ্চদশ শতাব্দী

প্রথমার্দ্ধ—কৃত্তিবাসেব বামায়ণ।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—বড়ু চণ্ডীদাসেব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্তেব মনসামঙ্গল (?)।

ষোড়শ শতাব্দী

প্রথমার্দ্ধ—কবীন্দ্রেব মহাভারত, শ্রীকব নন্দীব অশ্বমেধ-পব্ব, মাধব আচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ভাগবতাচার্য্যেব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতবঙ্গিণী, বৃন্দাবন-দাসেব চৈতন্যভাগবত, লোচন দাসেব চৈতন্য-মঙ্গল ও দুর্ল্লভসাব।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ, হরিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিবাজেব চৈতন্য-চরিতামৃত, কৃষ্ণদাসেব শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বংশীবদনের মনসামঙ্গল নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল ও কালিকাপুরাণ, মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, মাধব আচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল,

মাধব আচার্য্যের গঙ্গামঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, কবিবল্লভের রসকদম্ব, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, "দুঃখী" শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল, কবিশেখরের গোপালবিজয়।

সপ্তদশ শতাব্দী

প্রথমার্দ্ধ—কাশীরামের মহাভারত; গুরুচরণ দাসের প্রেমামৃত, যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দ, বিদগ্ধমাধব, দানকেলীকৌমুদী ও গোবিন্দ-লীলামৃত, গদাধর দাসের জগৎমঙ্গল, দৌলৎ কাজীর সতী ময়নামতী, রাজবল্লভের বংশীবিলাস, গতিগোবিন্দের বীররত্নাবলী।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—গোপীবল্লভ দাসের রসিকমঙ্গল, আলাওলের পদ্মাবতী, সিকন্দরনামা, ও হপ্তপৈকর ইত্যাদি, ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গল, অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণ, ভবানন্দের হরিবংশ, পরশুরামের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, মনোহর দাসের অনুরাগবল্লী, মনোহর দাসের দিনমণিচন্দ্রোদয়, কালিদাসের মনসামঙ্গল, কমললোচনের চণ্ডিকাবিজয়, ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল, রূপনারায়ণের দুর্গা-মঙ্গল, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গল, রতিদেবের মৃগলুব্ধ, কবিচন্দ্রের শিবায়ন, কৃষ্ণরামের কালিকা-মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল ও রায়মঙ্গল, সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানপ্রদীপ, ও নবীবংশ ইত্যাদি, শেখ চাঁদের

বল্লভবিজয়, সীতারামের ধর্মমঙ্গল, রূপরামের ধর্মমঙ্গল, শ্যাম পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল।

অষ্টাদশ শতাব্দী

প্রথমার্দ্ধ—কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল, প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী ও বংশীশিক্ষা, নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর নরোত্তমবিলাস, বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্র, রামজীবনের মনসামঙ্গল ও আদিত্যচরিত, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, রামেশ্বরের শিবায়ন. জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের মনসা-মঙ্গল, ভবানীশঙ্করের মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা, সহদেব চক্রবর্ত্তীর অনিলপুরাণ।

দ্বিতীয়ার্দ্ধ—ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গল, মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল, রামদাস আদকের অনাদি-মঙ্গল, রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, জয়নারায়ণের কাশীখণ্ড, বিশ্বম্ভরের জগন্নাথমঙ্গল।